উরুভঙ্গ

ভাস

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

উরুভঙ্গ

ভাস

অনুবাদ

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দেব

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪০৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪২১ জানুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0405-X

URUBHANGA
Bengali translation of the classic Sanskrit play by Bhasa
Translated from Sanskrit by Sri Surendranath Dev
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Price : Tk. 100.00 only

ভূমিকা

(এক)

উৎসে ফেরা

মহান্ নাট্যকার ভাস-কৃত একাঙ্কিকা *উরুভঙ্গ* বহুলাংশে *মহাভারতে*র মহাযুদ্ধপর্বের অন্তিম পর্যায়ের বৃত্তান্তকে উপজীব্য করে লেখা। মূলের সাথে মিল বা অমিল যা-ই খুঁজি না কেন— *মহাভারতে*র নবম পর্ব— শল্যপর্বের অন্তর্গত গদাপর্বে আমাদের যেতে হবে। তার আগে আমরা আমাদের আলোচ্য একাঙ্কিকাটির কথাবস্তু সংক্ষেপে উপন্যস্ত করি :

যুদ্ধে কৌরবপক্ষ বিধ্বস্ত, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র আজ কোথায়? অবশিষ্ট কেবল দুর্যোধন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অবশ্য পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ সবাই রয়েছেন। নিহত রাজা-রাজড়াদের ছিন্নভিন্ন দেহে সমাকীর্ণ সারা সমন্তপঞ্চক এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে— প্রাণহীন হাতি, রথ এবং অস্ত্রশস্ত্র সব ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।

এমনি ভয়াল মৃত্যুপুরী, সমন্তপঞ্চকের আকাশে বাতাসে সহসা ধ্বনিত হল পুনঃ ঘনঘোরগর্জন— পৃথিবী-কাঁপানো সেই গর্জনে সচকিত সকলে ক্রমে জানতে পারল— ওই শব্দ আসলে গদাযুদ্ধে উদ্যত দুই বীরপুঙ্গবের মত্ত রণহুঙ্কার। গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই যোদ্ধা আর কেউ নন— দ্রৌপদীর অবমাননার প্রতিশোধের সুযোগসন্ধানী ভীমপ্রতিজ্ঞ ভীমসেন আর শত ভ্রাতার শোচনীয় হত্যায় ক্ষিপ্ত দুর্যোধন। কুরুকুল ও যদুবংশের পূজ্য অভিভাবক ব্যাস, বলদেব, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখের সম্মুখেই শুরু হয়েছে এই গদাযুদ্ধ।

নানাভাবে জানা কৌশলে দুই বীর পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলেন। কাঁধে, কপালে, বুকে আঘাতে প্রত্যাঘাতে গদাশব্দে চারদিক মুখর হয়ে উঠল। রক্তের ফোয়ারা ছুটছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই দুজনের কারো, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করে পুনর্বার ঘোরনাদে গদাপ্রহারে প্রবৃত্ত হচ্ছেন— দুর্যোধন লাফ দিয়ে আঘাত করছেন— ভীম সে আঘাত ব্যর্থ করলেন, আবার ভীম ছুটে চললেন দুর্যোধনের দিকে, দুর্যোধন বিশেষ কৌশলে সে প্রচেষ্টা বিফল করে দিলেন। এ তুমুল গদাযুদ্ধে কেউ যেন কারো চেয়ে কম নন— তবু মনে হয়, দুর্যোধনের হাত প্রচণ্ড শক্তিধর ভীমের তুলনায় পাকা।

দুর্যোধনের দারুণ আঘাতে ভীমের মাথা থেকে সবেগে রক্তক্ষরণ হতে লাগল, হাত পা শিথিল হয়ে পড়ল তাঁর, তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে ব্যাস প্রমাদ গুনলেন, যুধিষ্ঠির অস্থির হলেন, বিদুরের চোখ ঝাপসা হল। অর্জুন হাতে তুললেন গাণ্ডীব, কৃষ্ণ তাকালেন আকাশের দিকে। অরা, বলদেব শিষ্যের কৃতিত্বে লাঙল ঘোরাতে লাগলেন।

না, দুর্যোধন কিন্তু ওই দুর্বল মুহূর্তে অবসন্ন ভীমকে কোনো আঘাত করলেন না। রণ-সৌজন্যে ভরপুর দুর্যোধন তাঁকে বললেন— ভয় করো না ভীমসেন, বীর কখনও বিপন্নকে হত্যা করেন না।

এই মুহূর্তে ভীমকে বিদ্রূপে জর্জর হতে দেখে কৃষ্ণ নিজ ঊরুতে আঘাত করে কী এক ইঙ্গিত করলেন তাঁকে, এবং সেই ইঙ্গিত তাঁকে দিল নতুন প্রাণশক্তি। নিজ গদা চিত্রাঙ্গদাকে দুহাতে সজোরে ধরে সগর্জনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

নবোদ্যমে শুরু হল আবার গদাযুদ্ধ। সহসা ভীম দুর্যোধনের লাফিয়ে ওঠার মুহূর্তে কৃষ্ণের ইঙ্গিতমতো রণনীতি বিসর্জন দিয়ে গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই ঊরু ভগ্ন করলেন। পড়ে গেলেন দুর্যোধন। দুর্যোধনের পতন দেখে দ্বৈপায়ন আকাশে উঠলেন। চোখ মেলে দুর্যোধনের এ দশা দেখতে পারছিলেন না বলদেব, তাই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। এই ফাঁকে ব্যাসের নির্দেশমতো ভীমকে পাণ্ডবেরা চারদিকে বাহুবেষ্টন রচনা করে সরিয়ে নিয়ে গেলেন— চলার পথে কৃষ্ণের দুটি বাহু হল ভীমের অবলম্বন।

এইভাবে ভীমের নিরাপদ নিষ্ক্রমণ দেখতে দেখতে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে বলদেব অগ্রসর হলেন সমুপস্থিত রাজাদের দিকে, বললেন তিনি— তাঁর উপস্থিতিকে পর্যন্ত গ্রাহ্য না করে ভীম যুদ্ধের রীতিনীতি বর্জন করে যা করলেন, তা ক্ষমার অযোগ্য। এরপর তিনি দুর্যোধনকে ততক্ষণ নিজেকে সামলে রাখতে বললেন যতক্ষণ না তিনি ভীমের রক্তাক্ত বুকে তাঁর মারাত্মক হল চালনা করেন।

দূর থেকে বলদেবের এই ভীষণ সংকল্পের কথা শুনতে পেয়ে দুর্যোধন ওই অবস্থায় ভাঙা দুই ঊরু সহ দেহটাকে টানতে টানতে কোনোমতে বলদেবের কাছে এলেন, মাথা নত করে সনির্বন্ধ নিবেদন করলেন তিনি,— ভগবন্! প্রসন্ন হোন আপনি। ত্যাগ করুন আপনার ক্রোধ। কুরুকুলের প্রয়াতদের উদ্দেশে তর্পণবারি দিতে বেঁচে থাক পাণ্ডবেরা, আমাদের তো সব শেষ— 'বৈরং চ বিগ্রহকথাশ্চ বয়ং চ নষ্টাঃ'। বলদেব কিন্তু তবু তাঁর সংকল্পে অবিচল। দুর্যোধন তখন তাঁকে নিবৃত্ত করতে বললেন— ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, আমার শত ভ্রাতা স্বর্গত, আর আমার এই দশা। কী লাভ যুদ্ধ করে?

বলদেব জানালেন— তাঁর চোখের সামনেই দুর্যোধনকে ওইভাবে প্রতারিত করাতেই তাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে।

দুর্যোধন কিন্তু নিজেকে প্রতারিত বলতে চান না— তাই তাঁর কণ্ঠে বিস্ময় জাগে— 'বঞ্চিত ইতি মাং ভবান্ মন্যতে?' শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন বলদেবকে বললেন যে, জগতের প্রিয় হরিই তাঁকে ওইভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

এরপর দেখা যায়— দুর্যোধনের সন্ধানে এগিয়ে আসছেন শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, সঙ্গে গান্ধারী এবং দুর্যোধনের দুই রানি; তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে দুর্যোধনের শিশুপুত্র দুর্জয়। ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন দুর্যোধনকে। চলতে চলতে শ্রান্ত দুর্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র বলেন— 'যাও, পিতার কোলে বিশ্রাম কর।' দুর্জয় আবিষ্কার করল— তার পিতা মাটিতে বসে আছেন। পিতার কোলে উঠতে চাইল দুর্জয়, দুর্যোধন তাকে বারণ করলেন। দুর্জয় জানতে চায়— কেন তাকে কোলে বসতে বারণ করা হচ্ছে। শোক-গদগদ কণ্ঠে দুর্যোধন বলেন— 'তোমার পরিচিত ওই বসার জায়গাটি আর নেই, আমিও আর থাকছি না।' দুর্জয় জিগ্যেস করে— 'মহারাজ, কোথায় যাবেন?' 'যেখানে আমার শত ভ্রাতা গেছেন'— জানান তিনি। 'আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন'— মিনতি করে দুর্জয়। দুর্যোধন তাকে বলেন : 'যাও পুত্র, এ কথাটা ভীমকে বল।'

এরপর দেখা যায়— দুর্জয় তার পিতাকে পিতামহ-পিতামহী ও মায়েদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। সে যে এখনও ছোট্ট ছেলে, সে কথা দুর্যোধন তাঁকে বুঝিয়ে দেন।

এরপর ঘটে এক অতি করুণ সাক্ষাৎকার। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রার্থনা করেন— যে সম্মানসহ তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেই সম্মানসহই তিনি যেন স্বর্গে যেতে পারেন।

আর, গান্ধারীকে প্রণাম করে তিনি প্রার্থনা করলেন : 'যদি কোনো পুণ্য আমি করে থাকি, তবে জন্মান্তরেও আপনিই যেন আমার জননী হোন।'

গান্ধারী তদুত্তরে বললেন : 'আমার মনের কথাটাই তুমি বললে।'

দুর্যোধনকে দেখে রানি মালবী রোদন করছিলেন। দুর্যোধন তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি যুদ্ধের নানা ক্ষতে তথা শোণিতে ভূষিত হয়ে এক অভিনব সুষমা লাভ করেছেন। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন তো তিনি করেননি। অতএব, তাঁর মতো ক্ষত্রিয়নারীর এসব ভেবে রোদন করা সমীচীন নয়।

রানি পৌরবীকেও বললেন তিনি : বেদোক্ত নানা যজ্ঞও তিনি অনুষ্ঠান করেছেন, বান্ধবদের ভরণ করেছেন, শত্রুদের দমন করেছেন, শরণাগতদের সন্তুষ্টি-বিধান করেছেন, সংগ্রামে মহা মহা সেনানীকে পর্যুদস্ত করেছেন। এসব ভেবে তাঁর মতো পুরুষের স্ত্রীর রোদন করার কথা নয়।

পৌরবী বললেন— সহমরণের সংকল্পে তিনি মন বেঁধেছেন, তাই কান্না নেই তার।

এরপর দুর্যোধন দুর্জয়কেও ডেকে বললেন,— সে যেন পাণ্ডবদের পিতৃবৎ সেবা করে, কুন্তীর আদেশ পালন করে, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে মাতৃবৎ সম্মান

করে, পিতার দেহাবসানে যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে তিলোদক দান করে।

অতঃপর সেই শোকাকুল রণাঙ্গনে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন অশ্বত্থামা— তার ধনুকের টঙ্কার আকাশে বাতাসে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রতিপক্ষের সমুচিত জবাব দিতে তিনি রণোদ্যত— কিন্তু কোথায় তাঁর সাথে যুঝবার মতো যোদ্ধা?

এগিয়ে গেলেন তিনি দুর্যোধনের কাছে, ঘোষণা করলেন— সপাণ্ডব কৃষ্ণকে তিনি শাসন করবেন।

দুর্যোধন তাঁকে নিষ্ফল প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন, কারণ একে একে প্রায় সকলেই তো গেছেন— অবশিষ্ট আর কজনই-বা আছেন, বিশেষত তাঁর নিজের যখন এই অবস্থা, তখন গুরুপুত্রের ধনুক ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

অশ্বত্থামা তখন বললেন, ভীমসেন যুদ্ধে তাঁর দুটি উরুই কেবল চূর্ণ করেনি, দর্পও চূর্ণ করেছে।

এ অভিযোগ অস্বীকার করলেন দুর্যোধন, কেননা সম্মান রাখতেই না তিনি সংগ্রাম বরণ করেছিলেন। তাছাড়া, সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, বালক অভিমন্যুকে ওইভাবে বধ করা, পাশাখেলার ছেলে পাণ্ডবদের শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্য জীবনে ঠেলে দেওয়া— এসব ভাবলে দেখা যাবে, সেই তুলনায় তাঁর দর্প চূর্ণ করতে পাণ্ডবেরা অতি সামান্যই করেছে।

অশ্বত্থামা তখন তাঁর শপথের কথা ব্যক্ত করলেন যে, নৈশযুদ্ধ শুরু করে তিনি পাণ্ডবদের দগ্ধ করবেন। এ কাজে বলদেবেরও সমর্থন মিলল।

ইত্যবসরে অশ্বত্থামা বিনা অনুষ্ঠানে কেবল ব্রাহ্মণবাক্যবলে দুর্জয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। দুর্যোধন বলে উঠলেন— 'হন্ত! কৃতং মে হৃদয়ানুজ্ঞাতম্।' অতঃপর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুর্যোধন এক স্বপ্নিল আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে বীরের স্বর্গারোহণের নানা সুখদৃশ্য দেখতে দেখতে গতাসু হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সংকল্প করলেন, পুত্রহীন নিষ্কুল রাজ্যে ধিক্! সজ্জনের শরণ্য তপোবনেই তিনি যাবেন।

অশ্বত্থামা উচ্চারণ করলেন তাঁর সংকল্প— অদ্য রজনীতে সৌপ্তিকবধে প্রস্তুত আমি ধনুর্বাণহস্তে চললাম।

দুই

মহাভারতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গকে কেন্দ্র করে আগে পরে যা ঘটেছে, প্রাসঙ্গিক কথাসূত্র হিশেবে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এখানে দেওয়া প্রয়োজন। মূলে আছে :

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁর একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হলে দুর্যোধন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। তাই তিনি দ্রুত গদাহস্তে পূর্বমুখে প্রস্থান করলেন। পথিমধ্যে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা। দুর্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁকে বললেন, "পিতাকে বোলো— মহাযুদ্ধ থেকে পালিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে আমি এই দ্বৈপায়ন-হ্রদে শুধু প্রাণে বেঁচে আছি।" এই কথা বলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশ করে জলস্তম্ভন-বিদ্যাবলে জল স্তম্ভিত করে তথায় আত্মগোপন করে রইলেন।

সঞ্জয়ের মুখে দুর্যোধনের সংবাদ পেয়ে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা চলে এলেন সেই হ্রদের তীরে। তাঁরা কত করে দুর্যোধনকে জল থেকে উঠে আসতে বললেন। দুর্যোধন অনুনয় করে জানালেন— রাতটা তিনি বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যুদ্ধে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন, তার আগে নয়।

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ জলপানের জন্য সেই হ্রদের নিকটে উপস্থিত হয়েছিল। পাণ্ডবেরা যে দুর্যোধনকে কত খোঁজাখুঁজি করছিলেন, সে কথা ব্যাধেরাও জানত। আড়ালে থেকে তারা দুর্যোধন ও কৃপাচার্যদের সমস্ত কথা শুনল। দুর্যোধন যে হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, একথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না। এমন সংবাদ পাণ্ডবদের দিতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো পুরস্কার মিলবে— এই আশায় তারা অবিলম্বে গিয়ে ভীমের কাছে সব বলল। ব্যাধদের প্রচুর অর্থ দিয়ে পাণ্ডবেরা চললেন দ্বৈপায়নে। অভিমানী দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির কড়া কথায় বললেন, "সবাইকে যমের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে প্রাণভয়ে পালিয়ে এলে দুর্যোধন? বীর হয়ে এ কাজটা তুমি কেমন করলে? ওঠ, যুদ্ধ কর।"

দুর্যোধন বললেন, "কার জন্য আর যুদ্ধ করব? আমি মৃগচর্ম পরে বনে যাব, আপনারা রাজ্য ভোগ করুন।" যুধিষ্ঠির তখন বাক্যের কশাঘাতে দুর্যোধনকে জর্জরিত করলেন। অসহিষ্ণু হয়ে জল থেকে উঠে এলেন দুর্যোধন!

এরপর যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবমতো দুর্যোধন যে কোনো একজনের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে সম্মত হলেন। ভীম গদা হাতে নিয়ে দুর্যোধনকে আহ্বান করলেন যুদ্ধে। যুদ্ধের উপক্রম হিসেবে প্রথমে চলল কিছুক্ষণ তীব্র বাগ্‌যুদ্ধ। এমন সময় হলায়ুধ বলরাম এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন— দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখার জন্য। বলরাম সম্মত হলেন।

বাগ্‌যুদ্ধের পর আরম্ভ হল তুমুল গদাযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে জিগ্যেস করলেন— এঁদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? উত্তরে কৃষ্ণ জানালেন— ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাজিত করা অসম্ভব। কৃষ্ণ স্পষ্টই বললেন— ছলনা ছাড়া দুর্যোধনকে বধ করার অন্য উপায় নেই। ক্ষেত্রবিশেষে দেবতারাও এরূপ ছলের আশ্রয় নেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করার যে প্রতিজ্ঞা ভীম সভায় করেছিলেন,

কৃষ্ণ তাঁরও উল্লেখ করলেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন—

"ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ॥"

এরপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে ভীম মহাবেগে দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে ছুটলেন, দুর্যোধন আঘাত পরিহারের জন্য লাফ দিয়ে শূন্যে ওঠামাত্র ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন করে গদাঘাতে তাঁর উরুদ্বয় ভগ্ন করলেন। সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন দুর্যোধন : 'স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্'।

এরপর যুধিষ্ঠির সাশ্রুকণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন— 'দুঃখ করো না ভ্রাতা। তোমারই পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল তুমি ভোগ করছ— 'নূনং পূর্বকৃতং কর্ম সুঘোরমনুভূয়তে।' যুধিষ্ঠির এও বললেন যে, দুর্যোধন বীরের যোগ্য মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে যাবেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ রাজ্য পেয়েও স্বজনবিয়োগের দারুণ দুঃখ ভোগ করবেন।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত বলরাম ভীমকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। নাভির নিচে আঘাত করে ভীম শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেছে— এই বলে চিৎকার করতে করতে বলরাম তাঁর লাঙল তুলে ছুটলেন ভীমের দিকে। কৃষ্ণ তক্ষুণি গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বলরামকে— বোঝালেন তাঁকে নানাভাবে যে, এটা ছলনা হলেও ধর্মচ্ছল। তা ছাড়া প্রতিজ্ঞাপূরণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ভীম দ্যূতসভায় শপথ করেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরু তিনি গদাঘাতে ভাঙবেন, আর মহর্ষি মৈত্রেয়ও এই মর্মে দুর্যোধনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

বলরাম আর এগোলেন না ঠিকই, কিন্তু অপ্রসন্ন মনে যাত্রা করলেন দ্বারকার অভিমুখে।

এরপর যোদ্ধারা দুর্যোধনের শোচনীয় উরুভঙ্গে আনন্দ করতে লাগলেন আর ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তখন যোদ্ধাদের নিয়ে স্থানত্যাগে উদ্যত হলেন। দুর্যোধন থাকতে না পেরে কোনোমতে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করে বললেন : 'কংসবাসের পুত্র, তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের এই সর্বনাশ। নির্লজ্জ, তুমিই ভীমকে উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে।'

উত্তরে কৃষ্ণ বললেন— 'যা কিছু ঘটেছে সবই তোমার পাপের পরিণাম।'

এইভাবে দুজনের বাদানুবাদ চলতে থাকল। দুর্যোধন শেষে বললেন— যথাযথ রাজধর্ম পালন করে সম্মুখযুদ্ধে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করে তিনি এখন সুহৃদ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে স্বর্গে যাবেন, কিন্তু পাণ্ডবরা প্রতি মুহূর্তে দুঃখময় জীবনযাপন করবেন।

এই কথা বলামাত্র স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ গীতবাদ্য করতে লাগল, সিদ্ধগণ বলে উঠলেন, "সাধু, সাধু।" লজ্জায় মরে গিয়ে পাণ্ডবেরা স্থানত্যাগ করলেন।

অতঃপর দুর্যোধনের কথামতো কৃপাচার্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে অশ্বত্থামা প্রস্থান করলেন। দুর্যোধন সেই অবস্থায় কালরাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

শল্যপর্বের বৃত্তান্ত মোটামুটি এখানেই শেষ। এরপর সৌপ্তিকপর্বের বৃত্তান্তাংশ কিছুটা প্রসঙ্গত এসে পড়ে। তা হল : সুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীপুত্রদের বধ করে শেষরাতে অশ্বত্থামা ছুটলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধনের প্রাণপ্রদীপ তখন নির্বাপিতপ্রায়। অশ্বত্থামা বললেন তাঁর সৌপ্তিকবধের কৃতিত্বের কথা। শুনে চক্ষু মেলে দুর্যোধন তাঁকে অভিনন্দিত করে বললেন, "আজ নিজেকে ইন্দ্রের মতো সুখী মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হোক, স্বর্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।" এই বলে দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করলেন। ভূতলে পড়ে রইল তাঁর দেহ, তিনি চললেন স্বর্গে।

এইবার আমরা দেখব— ভাস তাঁর এই একাঙ্কিকা *ঊরুভঙ্গে* কাহিনীর উৎসের কতটা কাছাকাছি বা সে উৎস থেকে তিনি কোথায় কতটা সরে এসেছেন।

১. ভাস এ নাটকে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণ নিজের তাঁর ঊরুতে আঘাত করে ভীমকে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের সংকেত দিয়েছেন, কিন্তু মহাভারতে এ কাজটি করেছিলেন অর্জুন।

২. এ নাটকে গদাযুদ্ধের দর্শকদের মধ্যে ব্যাস ও বিদুরের উপস্থিতি লক্ষণীয়, যার উল্লেখ মহাভারতে নেই।

৩. এ নাটকে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র দুর্যোধনের অন্বেষণে আসতে দেখা গেছে, পৌত্র দুর্জয় তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, উপরন্তু দুর্যোধনের দুই রানি মালবী ও পৌরবীকেও স্বামীর সন্ধানে আনা হয়েছে। *মহাভারতে* কিন্তু ঊরুভঙ্গের পরে দুর্যোধনকে দেখতে ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী কেউ আসেননি ওই যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁরা তখন দূরে হস্তিনাপুরে। তাছাড়া, দুর্যোধনের পুত্র বা পত্নীর অনুরূপ উপস্থিতির কোনো উল্লেখ মূলে নেই। অনুরূপ একটিমাত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাসের উদ্ভাবনী শক্তি এবং নাট্যকার হিশেবে কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশ এখানে এত ঘরোয়া এবং অন্তরঙ্গ যে, দুর্যোধন স্নিগ্ধ স্বজনপরিবৃত হয়ে শেষশয্যায় শেষ মুহূর্ত কটি আবেগে ও স্নিগ্ধতায় অবিস্মরণীয় করে তুলেছেন।

৪. এ নাটকে আমরা দেখছি— দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিপ্রের বচন অনুসারে দুর্জয়কে দুর্যোধনের সম্মুখে রাজপদে অভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু *মহাভারতে* এ রকম মুহূর্তে আমরা অন্য এক অভিষেকের কথা শুনি— তা হল কৃপাচার্য কর্তৃক সেনাপতিপদে অশ্বত্থামার অভিষেক।

৫. ভাস *উরুভঙ্গে* দুর্যোধন-চরিত্রের পরিকল্পনায় মূল থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের তীব্র বাদানুবাদ এখানে অনুপস্থিত।

৬. *মহাভারতে*র তুলনায় বলরামের ভূমিকাও এ নাটকে অনেকটা স্বতন্ত্র। মূলে দেখি— রুষ্ট বলরাম ভীমের প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলে কৃষ্ণ তাঁকে অনুনয়-বিনয় করে নিবৃত্ত করতে তৎপর। আর, এ নাটকে কৃষ্ণ নন, স্বয়ং দুর্যোধনই বলদেবকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট।

৭. অশ্বত্থামার যুদ্ধোৎসাহ তথা সৌপ্তিকবধের ব্যাপারে দুর্যোধনের সমর্থন এ নাটকে দেখানো হয়নি, দুর্যোধন বরং অশ্বত্থামাকে অনুরোধ করেছেন— 'ধনুর্মুঞ্চতু ভবান্ (আপনি ধনুক ত্যাগ করুন)।' কিন্তু *মহাভারতে* দেখি, দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধচালনার দায়িত্ব দিতে উদ্‌গ্রীব। তিনি বলেছেন— 'আচার্য, শীঘ্রং কলশং জলপূর্ণং সমানয়।' অতঃপর কৃপাচার্যকে অনুরোধ করেছেন— 'মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণপুত্রোঽভিষিচ্যতাম্।' (আমার অজ্ঞাতসারে হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, দ্রোণপুত্রকে অভিষিক্ত করুন)।

৮. *উরুভঙ্গে* দুর্যোধনের মৃত্যু দেখানো হয়েছে সৌপ্তিকবধের পূর্বে, কিন্তু *মহাভারতে* সৌপ্তিকবধের সংবাদে অশ্বত্থামাকে অভিনন্দিত করে তবেই দুর্যোধনের মৃত্যু ঘটেছে।

আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে *উরুভঙ্গ*
নাট্য-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

ভাস বরাবরই তাঁর লেখার 'প্রস্তাবনা'র পরিবর্তে 'স্থাপনা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। *উরুভঙ্গে*ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই 'স্থাপনা'র মধ্যে সূত্রধার এবং পারিপার্শ্বিকের পারস্পরিক সংলাপ থেকে নিদারুণ সে সংবাদ পৌঁছে গেল শ্রোতার কাছে— তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে দুই মহাবলশালী যোদ্ধা— ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে। এই সংবাদ দিয়েই স্থাপনার দায়িত্ব এখানে শেষ।

এরপর ঘটে তিনজন সৈনিকের প্রবেশ। সৈনিকের মুখে যুদ্ধ ও বিচিত্র সব যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা যত ভালো শোনাবে, তত আর কারো মুখে নয়। নিপুণ নাট্যকার ভাস খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই বাস্তব-বোধের নাটকীয় ফসল শ্রোতার কাছে সযতনে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। নাট্যতাত্ত্বিক নিয়মে প্রকৃত অঙ্ক-দেহের মধ্যে যা যা প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে অন্যতম বিষয় যুদ্ধ। ভাস নিয়মের কথা ভেবেই হোক্, না ভেবেই হোক্, বিষ্কম্ভকের মধ্যে তিনজন সৈনিকের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে ভীম ও দুর্যোধনের মারাত্মক গদাযুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল, উভয়ের শারীর ভঙ্গী তথা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং যোদ্ধাদের ঘিরে সমবেত

ব্যাস-বলদেব-যুধিষ্ঠির-অর্জুন-বিদুর প্রমুখ দর্শকদের পরিবর্তমান হাবভাব তথা হর্ষ-বিপদের সুন্দর সালঙ্কার কাব্যিক ধারাবিবরণী শুনিয়েছেন শ্রোতাদের। না, যুদ্ধের এবংবিধ পরোক্ষ অথচ বাঙ্ময়, জীবন্ত বর্ণনাকে তথাকথিত অর্থোপক্ষেপক 'বিষ্কম্ভকে' স্থান দিয়ে ভাস নাট্য-নিয়মের কোনো অবমাননা করেননি। ভীমের অন্যান্য আঘাতে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ তথা পতন এবং ভীমের রণাঙ্গন থেকে সতর্ক নিষ্ক্রমণ— এ দুটি প্রধান সংবাদ যথাযথ পরিবেশিত হয়েছে এই বিষ্কম্ভকে। আর, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ হলায়ুধের সরোষে ভীমের অনুসরণের সংবাদে ভাবী সংঘর্ষের আশঙ্কায় সবার উদ্বিগ্ন হবার পালা। এখানেই অবসিত হল বিষ্কম্ভক।

এরপর নাটকের অঙ্কের তথা মূল অংশের শুরু। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের গতি অতি স্বচ্ছন্দ; নাটকীয় বৃত্ত ও নতুন নতুন ঘটনার সংশ্লেষে পুষ্টি ও চমৎকারিতায় ঋদ্ধিমান্। স্থাপনায় ভাস যে 'সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটম্' যুদ্ধের কথা শুনিয়েছেন সঃত্রধারপ্রমুখাৎ, বিষ্কম্ভকে যে যুদ্ধের অনুপম বাণী-আলেখ্য তিনি এঁকে দেখিয়েছেন ভটত্রয়ের জবানীতে, এবার সেই যুদ্ধের ফলশ্রুতি নানা চরিত্রের ইচ্ছা, কৃতি, যত্ন ও উপলব্ধির আলোয় শবলিত করে পরিবেশন করেছেন সার্থক নাট্যবেত্তা মহাকবি ভাস। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি, চরিত্র এবং তার অনুভূতির অনুগত ভাষাও কেমন অনায়াসে এসে পড়েছে। দুর্যোধন-চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতাও ঘটনার ধারাস্রোতে পর্যাপ্ত পরিণতির দিকে অব্যাহত এগিয়ে চলে। কিন্তু কোথায় সেই ধীরোদ্ধত পুরুষ যিনি 'ব্যায়োগ' শ্রেণির এ রূপকের নায়ক? ছলনাপরায়ণতার কোনো অবকাশ তো এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্যোধনের মধ্যে নেই। তবে ভীমসেনই কি সেই অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ধীরোদ্ধত নায়ক? ভীমসেনই যদি নায়ক হবেন, তবে তিনি কি শুধু ছলনায় দুর্যোধনকে বিধ্বস্ত করার নেপথ্য-নায়ক হয়েই এ রূপকের প্রধান বা 'আধিকারিক' নায়ক? মনে রাখতে হবে, *ঊরুভঙ্গ* একটি অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যকাব্য। কাজেই কোনো এক ঘটনার (সে ঘটনা যতই দুর্ধর্ষ বা মহতী হোক না কেন—) কৃতিত্বের দরুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরূপে উল্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও দৃশ্যকাব্যে যার আদৌ কোনো উপস্থিতি নেই তথা নাটকের কেন্দ্রীয় বৃত্তভাগকে পর্যাপ্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে যার কোনো ভূমিকা নেই, সে কীভাবে রূপকে 'নেতা' রূপে স্বীকৃত হতে পারে? তাই ভীমের পক্ষে এ রূপকের নেতা বা আধিকারিক নায়ক হওয়া মুশকিল। অন্যদিকে, *ঊরুভঙ্গের* দুর্যোধন *বেণীসংহারের* দুর্যোধনের মতো ধীরোদ্ধত তো নন, এ দুর্যোধনকে ঠিক ধীরোদাত্তও বলা চলে না। সত্যি বলতে কি, এ দুর্যোধন আলঙ্কারিক নিরিখে নির্দিষ্ট যে কোনো শ্রেণির নায়কই হোন বা কোনো অনির্দেশ্য শ্রেণির শরিক হোন— *ঊরুভঙ্গের* 'নেতা' যে ইনিই, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

উরুভঙ্গের একটি আভ্যন্তর সাক্ষ্যও এ মতের অনুকূল। পিতা-মাতা-বধূ-পুত্রের উপস্থিতির সময় থেকে মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত দুর্যোধন স্বনামে নাটকীয় পাত্ররূপে চিহ্নিত না হয়ে 'রাজা' বলে পরিগণিত হয়েছেন। সংস্কৃত নাটকে নায়ককে (যে নায়ক নিজে রাজাও বটে) তাঁর নামের পরিবর্তে 'রাজা' বলে উল্লেখ করার রীতি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তাই 'রাজা' শব্দের অনুরূপ ব্যবহার এ নাটকে দুর্যোধনের নায়কত্বের পক্ষেই সমর্থন স্থাপন করছে। সংশয় একটা থাকে— তা হল নাটকের পূর্বাংশে 'দুর্যোধন' আর উত্তরাংশে তার পরিবর্তে 'রাজা'— এটা লিপিকর-প্রমাদ নয় তো? হলেও হতে পারে, কিন্তু যখন থেকে যেভাবে এই 'রাজা' শব্দের ব্যবহার এ নাটকে আমরা পাই, তাতে নাট্যকারের এক সুগভীর অভিপ্রায়ের ব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে এই 'রাজা' কথাটি। ধৃতরাষ্ট্র যখন ডাকছেন : পুত্র দুর্যোধন! অষ্টাদশাক্ষৌহিণী-মহারাজ! কৃাসি?' তখন তার উত্তর এভাবে পাচ্ছি :

রাজা— অদ্যাস্মি মহারাজঃ।

দুর্যোধন যে অবস্থায় পড়ে নিজ পরিজনের কাছে এগিয়ে যেতে পারছেন না, তার মধ্যে রাজকীয়তার লেশমাত্র নেই, কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের কাছে 'রাজা', স্বভাব-রাজা দুর্যোধন নিজের কাছে তো চিরদিনই রাজা।

এই প্রসঙ্গে *মহাভারতের* কথাও মনে পড়ে। ভূলুণ্ঠিত দুর্যোধনকে ভীম পদাঘাত করলে যুধিষ্ঠির তাঁকে নিষেধ করে বলছেন :

একাদশচূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥ ৯।৫৯।১৭

এইবার আসি নাটকের শেষ স্মরণীয় দৃশ্য তথা সংলাপে। এ দৃশ্য দুর্যোধনের মৃত্যু-দৃশ্য, এ সংলাপ দুর্যোধনের শেষ সংলাপ। *মহাভারতে* মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার উদ্দেশে দুর্যোধন শেষ শুভশংসন জানিয়েছেন :

"স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সংগমঃ পুনঃ।"

এরপর *মহাভারতকার* জানিয়েছেন, দুর্যোধন সবাইকে কাঁদিয়ে স্থূল শরীর পৃথিবীতে ফেলে রেখে স্বর্গে চলে গেলেন— 'অপাক্রামদ্দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ'। এছাড়া *মহাভারত* থেকে আমরা জেনেছি, ভীমের অন্যায় আঘাতে দুর্যোধনের পতনে উল্কাপাত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখা দিয়েছিল এবং বাসুদেব-দুর্যোধন সংলাপে বাসুদেবের প্রতি ধিক্কারে দুর্যোধন যখন তাঁর বিধিমতো যজ্ঞ-দান-প্রজাপালন প্রভৃতি কর্মের উল্লেখ করে তাঁর স্বর্গগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কথা শোনান, তখন স্বর্গ থেকে পুষ্পবর্ষণ প্রভৃতি বহু শুভ নিমিত্ত দেখে সপাণ্ডব বাসুদেব লজ্জিত হয়েছিলেন। মূলের এ কথাগুলো মনে রেখে এবারে আমরা ভাস-কৃত এ রূপকে দুর্যোধনের মৃত্যু-দৃশ্যে তাঁর স্বর্গত পিতৃপিতামহ, কর্ণ, শত ভ্রাতা, অভিমন্যু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর স্বর্গীয়

সাক্ষাৎকার এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরার অভিনন্দন তথা সহস্রহংসবাহিত বীরবাহী বিমানে তাঁর স্বর্গপ্রয়াণের মর্মস্পর্শী বিষয়ের যদি সম্যক্ অনুধাবন করি, তবে দুর্যোধনের এ মৃত্যু যে রাজার যথার্থ বীরোচিত রাজকীয় মৃত্যু,— এ কথা মানতে বোধ হয় কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। এ 'মৃত্যু' *উরুভঙ্গ* রূপকের নায়কের মৃত্যু। কিন্তু মঞ্চের উপরে এ মৃত্যু-দৃশ্য নাট্যশাস্ত্রীয় নিয়মে তো অনাচার, অতএব নিষিদ্ধ। কিন্তু ভাস তবু দেখালেন। এক শ্রেণির পণ্ডিত মনে করেন— ভাস এখানে নাট্যশাস্ত্রোক্ত নিয়মের লঙ্ঘন খুব একটা করেননি, কারণ মৃত্যুর ব্যাপারটা তিনি মঞ্চের মধ্যে দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এ তো নায়কের মৃত্যু নয়, প্রত্যুতপক্ষে, নায়কের ঈশ্বরবিদ্বেষী ঘৃণিত শত্রুর শোচনীয় মৃত্যু নায়কের অভ্যুদয়েরই নামান্তর। প্রাচীনকালে পতঞ্জলির উল্লিখিত *কংসবধ* নাটকে তো কংসবধের দৃশ্য দেখানো হত। অতএব নাস্তিক, অনাচারী, পাপিষ্ঠ শয়তানের এতাদৃশ মৃত্যু দেখানোর একটা প্রথা সম্ভবত অনিষিদ্ধ ছিল। এই প্রথায় স্বতন্ত্র ধারার অনুসৃতি ভাসের কিছু নাট্যকর্মে আমরা দেখতে পাই। সেদিক থেকে ভাসের এই-জাতীয় মৃত্যুদৃশ্যের অঙ্কমধ্যে অবতারণা খুব দোষের নয়। তাঁর *বালচরিতে* ও আমরা দামোদরের হাতে চাণুর ও কংসের মৃত্যু দেখতে পাই। এইসব পণ্ডিতের মতে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্যোধন এ রূপকে প্রতিনায়ক। তাঁর সমুচিত শাস্তিই এ রূপকের বিষয়।

প্রথিতযশা সাহিত্যমীমাংসক এ. বি. কিথ্ বলেন "In the *Urubhanga* Duryodhana's hauteur to the highest of Gods meets with its just punishment : Duryodhana is the chief subject, but not the hero, of the piece which manifests the just punishment of the impious. The death of Duryodhana is admirably depicted..." (*The Sanskrit Drama*— Page 106.)

আমরা কিন্তু দুর্যোধনের এই মৃত্যুদৃশ্যের উপস্থাপনে ভাসের নাট্যচিন্তার অভিনবত্ব যেমন দেখি, তেমনি তিনি যে এ মৃত্যুকে দুর্যোধনের পাপের পরিণতি বলে আদৌ প্রতিপন্ন করতে চাননি, তাও হৃদয়ঙ্গম করি। এ মৃত্যু দুর্যোধনের নায়কোচিত মহনীয় মৃত্যু।

এ গেল নাট্যরীতির দিক। এবারে আমরা প্রসঙ্গত *উরুভঙ্গে* নাট্যাভিনয়ে যে বৈচিত্র্য দেখি, তার কিছু আলোচনা করব। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন—

"প্রয়োগো দ্বিবিধশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ
সুকুমারস্তথাবিদ্ধো নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ নাট্যাভিনয় মুখ্যত দ্বিবিধ— (১) আবিদ্ধ ও (২) সুকুমার। আবিদ্ধ অভিনয়ে সংঘর্ষ-সংগ্রাম, শারীরিক ঘাত-প্রতিঘাত, ছলনা-ইন্দ্রজাল, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি

উদ্ধত অমানবিক ব্যাপার প্রকটীভূত নয়। দেব, দানব, রাক্ষস ও মদোন্মত্ত মানুষই এই 'আবিদ্ধ' অভিনয়ের যথার্থ পাত্র। আর, 'সুকুমার' অভিনয়ে স্নেহ-প্রেম, মমতা-মাধুর্য এবং হৃদয়ের আরো বহু সুকুমার বৃত্তির কান্ত-কোমল প্রকাশ ঘটে। মানবিকতায় অভিষিক্ত এ অভিনয়ের পাত্রপাত্রী প্রধানত 'মানুষ'। 'আবিদ্ধ' অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকা অতি অল্প, কারণ স্ত্রীজনোচিত স্নিগ্ধ-মেদুরতায় নির্মম সে কাঠিন্যের যদি কিছু হানি হয় পাছে, তাই। কিন্তু 'সুকুমার' অভিনয়ে নারীর ভূমিকা নৃত্য-গীতে, সারল্যে-তারল্যে, কান্ত-কোমলে, প্রেমে-প্রণয়ে অতি মূল্যবান্। নারীর ঈদৃশ ভূমিকায় এ অভিনয় সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের লালিত্যে সহজেই মন কেড়ে নেয়।

দশ প্রকার রূপকের মধ্যে যারা যারা উক্ত 'আবিদ্ধ'-সংজ্ঞক অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত তাদের মধ্যে 'ব্যায়োগ' অন্যতম। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন :

ডিমঃ সমবকারশ্চ ব্যায়োগেহামৃগৌ তথা।
এতান্যাবিদ্ধসংজ্ঞানি বিজ্ঞেয়ানি প্রযোক্তৃভিঃ ॥
(না. শা. ১৪।৬০)

উরুভঙ্গ যে 'আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে' 'ব্যায়োগ' শ্রেণির রূপক, সে কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং *উরুভঙ্গে* তথাকথিত আবিদ্ধ অভিনয়েরই জয়জয়কার লক্ষণীয় হবার কথা। যুদ্ধ-বিগ্রহ-ছলনাসংকুল এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় হিংসা-লোভ ও জিগীষার আদিময়তার এক উগ্র উদ্ধত রাজসিক রূপ। "এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় পূর্ণাঙ্গ 'রূপক' নহে, ইহা সম্পূর্ণ এক সংগ্রাম-চিত্র (fighting picture)। প্রারম্ভে সংগ্রামের উত্তেজনা, পরিশেষে বিষয়ের উন্মত্ততা, ইহাই এই জাতীয় নাটকীয় রূপ অথবা রূপকের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সংগ্রাম-সংকট থাকিলেও নাটকীয় সংকট (dramatic crisis) নাই, আত্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা থাকিলেও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাই।" (*ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, পৃ. ৯৪)

উরুভঙ্গে এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় পূর্বাংশে যেমন রয়েছে, উত্তরাংশেও কিছু কিছু রয়েছে। কিন্তু ছেদ্য-ভেদ্য-যুদ্ধাত্মক অভিনয় আমরা এ রূপকের গদাযুদ্ধপর্বে আদৌ চোখে দেখি না, কানে শুনি; এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় যে, অনুরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় তথাকথিত নাট্যতাত্ত্বিকদের অননুমোদিত। তাই বিষ্কম্ভকে বরং ভটদের নিপুণ অভিনয়েই আমরা সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের পরিবেশ, আরম্ভ, উত্তেজনা এবং উন্মত্ততার নিখুঁত এক ছবি পেয়েছি। অতঃপর বলদেবের ক্রুদ্ধমূর্তি, রণ-হুঙ্কার, ভীমের বক্ষে লাঙ্গল-চালনার সোচ্চার সংকল্প এবং পাণ্ডবদের বধ করে দুর্যোধনের স্বর্গপথের অনুযাত্রী করার স্পর্ধিত উচ্চারণে আমরা 'আবিদ্ধ' অভিনয়ের পরিচয় পাই। নাটকের শেষাংশে উদ্যতাস্ত্র অশ্বত্থামার আবির্ভাবে এবং তাঁর যুদ্ধোদ্যমে তথা একেবারে শেষে পাণ্ডবদের নৈশ যুদ্ধে দগ্ধ করার শপথে ও

সেই শপথের রূপায়ণে তীরধনুক হস্তে তাঁর 'সৌপ্তিকবধ' যাত্রায় আমরা 'আবিদ্ধ অভিনয়েরই পরিচয় পাই। রঙ্গমঞ্চের উপরে বলদেব ও অশ্বত্থামার এ-জাতীয় অভিনয় আমরা যেমন দেখি, তেমনি শুনি, বিষ্কম্ভকে কথিত আবিদ্ধাংশের সঙ্গে এর এই পার্থক্য কিন্তু লক্ষণীয়।

তবুও এ রূপক নামে *উরুভঙ্গ* শ্রেণিতে 'ব্যায়োগ' এবং অভিনয়ে 'আবিদ্ধ'— হলেও এগুলোই এর বড় পরিচয় সম্ভবত নয়। 'সুকুমার' অভিনয়ের কোমলতা, স্নিগ্ধতা এবং কারুণ্যের সুষমাও এ রূপকের অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে, যা 'আবিদ্ধ' অপেক্ষা দর্শক-মনের ওপর বরং বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারীর উপস্থিতির আবেগ-পেলব দৃশ্য তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনের মুহূর্তে দুর্যোধনের আত্মনিবেদন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকসিক্ত সংলাপ, দুর্জয়ের জন্য দুর্যোধনের সশঙ্ক ভাবনা, পিতৃপাদবন্দনের অক্ষমতায় দুর্যোধনের মানসিক প্রতিক্রিয়া, অবস্থার পরিবর্তনে স্নেহের পুত্তলী পুত্র দুর্জয়ের কোলে চড়ার ব্যর্থ জিদ, দুর্যোধনের আত্মসমীক্ষা, রানিদের অনবগুণ্ঠিত মস্তকে রণাঙ্গনে স্বামীর সন্ধান, গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনের পুনর্জন্মলাভের বাসনা প্রভৃতি স্থলগুলো 'সুকুমার' অভিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এতএব, এদিক থেকে অর্থাৎ 'আবিদ্ধ' ও 'সুকুমার' অভিনয়ের একসঙ্গে পাশাপাশি থাকায় এই যে নাট্যাভিনয়-বৈচিত্র্য, এদিক থেকেও *উরুভঙ্গ* এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। অবশ্য *উরুভঙ্গের* কারুণ্য এবং এই দ্বিবিধ অভিনয়ের সংমিশ্রণ, আর সব শেষে 'অভ্যুদয়ান্ত' শব্দের মনোমতো ব্যাখ্যান ('অভ্যুদয়ঃ অন্তে যস্য'র পরিবর্তে 'অভ্যুদয়স্য অন্তঃ যস্মিন্') অবলম্বন করে কেউ কেউ একে 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক' বলতে চান, কিন্তু তাও সম্ভব নয়, কারণ— উৎসৃষ্টিকাঙ্কে পাত্র প্রাকৃত মানুষ, যুদ্ধ কেবলই বাগ্‌যুদ্ধ। স্ত্রী-ভূমিকার বাহুল্য, উপস্থিতির তারল্য তথা বিলাপের রোল ওই রূপককে করুণার্দ্র করে তোলে এবং এতে তার উচ্চাঙ্গের নাট্যশিল্পে উত্তরণের পথও প্রায় রুদ্ধ হয়। সর্বোপরি, উৎসৃষ্টিকাঙ্কের শেষটা যথার্থই 'অভ্যুদয়ান্ত' হবে, না 'বিয়োগান্ত' হবে, সেটা রীতিমতো সন্দিগ্ধ বিষয়। নাট্যশাস্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে— 'কর্তব্যোহভ্যুদয়ান্তঃ'; *দশরূপক* বা *সাহিত্যদর্পণে* অবশ্য এ কথাটির কোনো উল্লেখ নেই বা এর কোনো পরিবর্ত শব্দও নেই, এমনকি অনুরূপ মর্মে কোনো ব্যাখ্যানও নেই।

সুতরাং, সব দিক বিবেচনা করে *উরুভঙ্গ* সম্পর্কে একথা অকুণ্ঠে বলা যায় যে, এই নাট্যগ্রন্থটির রূপ (form) ও আঙ্গিক (Technique) এমনি ধরনের যে, প্রথাসিদ্ধ কোনো এক শ্রেণির রূপকের সঙ্গে এর হুবহু মিল নেই। সেদিক থেকে এ রূপক নিজেই একটি অভিনয় 'টাইপ'।

উরুভঙ্গে ভাসের ভাষা ও শৈলীগত স্বাতন্ত্র্যও বেশ চোখে পড়ে। দৃশ্যকাব্য হলেও তথাকথিত সালংকারা কাব্যরীতিই এখানে পরিস্ফুট। তাই, অন্যান্য নাটকের তুলনায় এ নাটকে ভাসের লেখনীতে গদ্যের মতো পদ্যেও কিছুটা বেশি কাঠিন্য, ওজস্বিতা এবং কোথাও কোথাও কিছু দুরূহতাও স্থান পেয়েছে। অথচ এমন স্থলও অবিরল যেখানে অন্যান্য বহু নাটকের নাট্যকার ভাসের ভাষারীতিকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না। চিত্রকল্প (image) সৃষ্টিতেও তাঁর আয়াস-সাধ্যতা চোখ এড়ায় না, যেমন ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি যুদ্ধকে এক ভয়ঙ্কর যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাতিদের শুঁড়গুলো যজ্ঞের যূপ, বিক্ষিপ্ত বাণগুলো ছড়ানো কুশ, নিহত হাতিদের স্তূপীকৃত দেহগুলো যজ্ঞের বেদী যাতে বৈরবহ্নি প্রদীপ্ত রয়েছে, তুমুল রণনির্ঘোষ যজ্ঞের পূত মন্ত্রের উচ্চ কণ্ঠে-উচ্চারণ, পতিত মানুষগুলো যজ্ঞের মেধ্য পশু। ভাসের এ লেখায় আর এক বিসদৃশ বিস্ময় দীর্ঘসমাসবদ্ধ বহু বিশেষণান্বিত সম্বোধন যা অশ্বত্থামার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে— "ভো ভোঃ। সমরসংরম্ভোভয়বল-জলধি-সঙ্গম-সময়-সমুত্থিত-শস্ত্র-নক্র-কৃত্তবিগ্রহাঃ স্তোকবশেষশ্বাসানুবদ্ধমন্দপ্রাণাঃ সমরশ্লাঘিনো রাজানঃ।" সুখের বিষয়, এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত এ নাটকে এই একটিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই সামান্য কিছু বৈসাদৃশ্য বাদ দিলে আর সর্বত্র ভাসের গদ্য এবং পদ্য অত্যন্ত হৃদ্য। সংলাপগুলোও প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর এবং পরিস্থিতি ও মানসিকতায় ঔচিত্যের অনুগত এবং শিল্পগুণে সমৃদ্ধ।

চরিত্র-চিত্রণ

ভাসের অলোকসাধারণ নাট্যপ্রতিভার সর্বাপেক্ষা সার্থক ফসল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো। চরিত্রসৃষ্টিতে, সে যে ধরনের চরিত্রই হোক না কেন, ভাসের পরিকল্পনা-পটুত্ব, মানবমনের গহন অনুধ্যান এবং বাস্তবের ক্যানভাসে কল্পনার ইন্দ্রধনু, আঁকার মুনশিয়ানা তাঁকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রথম কক্ষার শ্লাঘ্য আসনে বসিয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে একদিকে যেমন রয়েছে জীবনধর্মিতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নাটকে বর্ণিত ঘটনার বা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে চরিত্রের একটা সুসঙ্গত আনুগত্য।

তাঁর অনন্যসাধারণ নাট্যকৃতি একাঙ্ক *উরুভঙ্গে* মহাকবি ভাস 'দুর্যোধন' চরিত্রটি কীভাবে এঁকেছেন, সে বিষয়েই এখন আমরা মনোনিবেশ করছি।

যোদ্ধা দুর্যোধন তথা ব্যক্তি দুর্যোধনের হার-না-মানা জীবনের অন্তিম পর্বটিকে নিয়ে ভাস অতি অন্তরঙ্গতার সঙ্গে নিবিড় অনুশীলন করে *মহাভারতোক্ত* অন্ধকার দিক্‌গুলোতে স্বকীয় প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রভা-প্রক্ষেপণে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অভিনব এক 'দুর্যোধন' নির্মাণ করেছেন। এ দুর্যোধনকে আমরা ঠিক মহাভারতে পাই

না, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্য কোনো গ্রন্থেও পাই না। *উরুভঙ্গের* দুর্যোধন একান্তভাবেই ভাসের অসাধারণ অনন্য সৃষ্টি।

উরুভঙ্গের দুর্যোধন চরিত্রটিকে যাতে সুষ্ঠু অনুধাবন করা যায়, তার জন্য আমরা ভাসের অন্যান্য নাটকে দুর্যোধন-চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত ও উপস্থাপিত হয়েছে, তার কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্বে করে নিতে চাই। *উরুভঙ্গ* ছাড়া আর যে তিনটি নাটকে দুর্যোধন চরিত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য হল— *পঞ্চরাত্র*।

পঞ্চরাত্র রূপকের প্রধান নায়ক দুর্যোধন। *পঞ্চরাত্রের* দুর্যোধন *মহাভারতের* দুর্যোধন থেকে কেবল মহত্তরই নন, মানবিক গুণে তিনি অনেক বেশি আকর্ষণীয়। *মহাভারত*-কাহিনী থেকে অনেক সরে এসে ভাস এখানে ধর্ম-নিষ্ঠ, সত্যসংকল্প, উদার মোহনীয় এক ব্যক্তিত্বরূপে দুর্যোধন-চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। রাজ্যার্ধ দেবার জন্য যুদ্ধের কোনো অবতারণার কথা এখানে নেই। পাণ্ডবদের আবিষ্কারের যে শর্ত— তাও কুটিলপ্রকৃতি শকুনির সংযোজন। রাজ্যার্ধ না দিলে পাণ্ডবেরা তা কেড়ে নেবে, দ্রোণের এই মন্তব্যে দুর্যোধনের আত্মাভিমানে যে আঘাত লেগেছে— এটাও লক্ষণীয়। যিনি দেবার জন্য ব্রতী, সেখানে কেড়ে নেবার প্রসঙ্গ সত্যি অমর্যাদাকর। কিন্তু না, কোনো প্ররোচনাই দুর্যোধনকে তাঁর সংকল্প থেকে চ্যুত করতে পারেনি।

অধিকন্তু, দুর্যোধন-চরিত্রের অপূর্ব বাৎসল্য ও মানসিকতার দিকটিও এ নাটকে অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট। অর্জুন-নন্দন অভিমন্যু গোহরণ-যুদ্ধে কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড বলশালী বিশালদেহী এক পুরুষের হাতে বন্দি হয়। এ সংবাদ শোনামাত্র ক্ষোভে লজ্জায় শংকায় চঞ্চল দুর্যোধন অবিলম্বে অভিমন্যুর মুক্তির জন্য তৎপর হলেন। তিনি বললেন— 'অহমেবৈনং মোক্ষয়ামি'— তাঁর জাগ্রত বিবেকবাণী— জ্ঞাতিবিরোধজনিত বৈরিতা তো বড়দের ব্যাপার, তার মধ্যে বালকদের জড়ানো অনুচিত, তাদের তো কোনো দোষ নেই—

"অথ চ মম স পুত্রঃ পাণ্ডবানাং তু পশ্চাৎ।
সতি চ কুলবিরোধ নাপরাধ্যন্তি বালাঃ ॥ ৩/৪

দূতবাক্যে ও ভাস দুর্যোধনকে অনেকটা *পঞ্চরাত্রের* দৃষ্টিভঙ্গিতেই আঁকতে চেয়েছেন। শান্তিকামী পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৃষ্ণ এসেছেন দুর্যোধনের কাছে। তাঁর প্রস্তাব— পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে হবে। দুর্যোধন কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, বিদ্রূপ করে বলেন : "পরাজিত শত্রুর কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে হয়। কেউ তা ভিক্ষা করে না অথবা কেউ তা দান করে না।" (শ্লোঃ ২৪) এখানে কৃষ্ণকে উত্ত্যক্ত করতে দুর্যোধন যে নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করেছেন, তার পেছনে রয়েছে সেই কুচক্রী প্রভাব। মানুষ দুর্যোধন এখানে পরিবেশ-পরিজনের প্রভাবে নিজের মদ্যোদ্ধত রূপটিকেই প্রকট করে তুলেছেন।

দূত-ঘটোৎকচের কাহিনী, বলতে গেলে, সবটাই ভাসের উদ্ভাবিত। এখানেও দুর্যোধন তাঁর আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ রেখে অভিমন্যু-বধকে যুদ্ধের অন্যতম অবাঞ্ছিত অথচ অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে সমর্থন করেছেন। যোদ্ধারূপে তিনি সামরিক স্বার্থে একে সমর্থন না করে পারেননি, আবার রাজারূপে তাঁর কর্তব্য হল— নিজ রাজ্যাধিকারে যাতে কারো কোনো আঘাত না আসে, তা সুনিশ্চিত করা। যোদ্ধার ভূমিকাই হোক, আর রাজার ভূমিকাই হোক, তা পালনের পন্থা সম্পর্কে তাঁর কোনো বাছ-বিচার আমরা দেখলাম না। আদর্শগতভাবে তাঁকে সমর্থন করা যায় না বটে, কিন্তু তাঁর মানবীয় দোষ-গুণ তাঁকে *মহাভারতোক্ত* বৃত্তের বাইরে এনে বৃহত্তর পরিধিতে উপস্থাপিত করে দোষে-গুণে ভরা সর্বজনবেদ্য মানুষরূপে তাঁকে চিত্রিত করেছে। সমস্ত সংশোধনের অতীত এক দুর্বৃত্তরূপে ভাস তাঁকে দেখাননি, যেমন ব্যাস দেখিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় কতগুলো দুর্বলতা যেমন তাঁকে দূষিত করেছে, তেমনি অতি বিরল মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় দুর্লভ কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁকে ভূষিত করেছে। মহাকবি ভাস তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে সর্বপ্রযত্নে দুর্যোধনকে মানবিক নায়ক (human hero) করে গড়ে তুলেছেন।

অতঃপর, *উরুভঙ্গে* ভাস পুনর্বার দুর্যোধনের নায়কোচিত ঔদার্যের ওপরেই আলোকসম্পাত করেছেন। বিষ্কম্ভকে প্রথম ভটের উক্তিতে আমরা জানতে পারি— ভীমসেন দুর্যোধনের গদাপ্রহারে ধরাশায়ী হলে দর্শকদের মধ্যে যখন সন্ত্রাস, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ভীমসেন যখন দুর্যোধনের শেষ আঘাতের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছেন যথার্থ বীর দুর্যোধন তখন তাঁকে হাসতে হাসতে অভয় দিয়েছেন— ".. ন তু ভীম! দীনং বীরো নিহন্তি সমরেষু ভয়ং ত্যজেতি" ॥২২॥ আর্ত বিপন্ন শত্রুকে আঘাত করতে নেই— এই শাস্ত্রকথা তথা বীরচরিত দুর্যোধন ভোলেননি, তাই পরম শত্রুর চরম দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তিনি ভীমকে কোনো আঘাত তখন করেননি। অথচ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের ভূমিকায় দুর্যোধন পেলেন এর ন্যক্কারজনক প্রতিদান।

ভগ্নোরু দুর্যোধন ভীমের প্রতি কৃতান্তসম ধাবমান বলদেবকে নিরস্ত করতে কীভাবে অশক্ত দেহটাকে দুই বাহু দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে এসে বলছেন : আপনার চরণে চিরপ্রণত এই শির পুনরায় নত করে প্রার্থনা করছি, ক্রোধ ত্যাগ করুন। কুরুকুলের প্রয়াত পুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ-জল দেবার জন্য অন্তত পাণ্ডবদের বাঁচতে দিন। নতুন করে কিছু পাবার যখন নেই, তখন কেন এই বৃথা উদ্যম— "বৈরং চ বিগ্রহকথাশ্চ বয়ং চ নষ্টাঃ।" বলদেবের সঙ্গে দুর্যোধনের সংলাপে এটা স্পষ্ট যে, উরুভঙ্গের ঘটনা দুর্যোধনকে শারীরিক দিক থেকে অবসন্ন করতে পারে, মানসিক দিক থেকে নয়। আত্মসচেতন যোদ্ধা তিনি, তাই বলদেবকে তিনি বলেছেন, বহু সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী ভীম তাঁর প্রাণহরণের জন্য যে কাণ্ডটা করেছেন,

তাইতে তাঁর প্রাণের মূল্য তিনি পেয়ে গেছেন। বঞ্চনার কথা তাঁকে বলায় তিনি সগর্বে জানালেন— তাঁকে তো কেউ হারাতে পারল না। ছল দিয়ে জয় অনেককেই করা সম্ভব, কিন্তু রণকৌশলে জয়— দুর্যোধনকে— কদাপি নয়—

"যদ্যেবং সমবৈষি মাং ছলজিতং ভো রাম! নাহং জিতঃ" ॥৩৪॥

বঞ্চনার প্রসঙ্গে দুর্যোধন শেষপর্যন্ত বলদেবের কাছে রহস্য উন্মোচন করে দিলেন— 'জগতঃ প্রিয়েণ হরিণা মৃত্যোঃ প্রতিগ্রাহিতঃ।' মারমুখী ভীমের গদায় সংকেতরূপে কৃষ্ণের প্রবেশের কথাও তিনি বললেন। ভাসের এ নাটকে দুর্যোধনের ঊরুতে গদাঘাতের ইঙ্গিত তো কৃষ্ণই ভীমকে দিয়েছেন। সুতরাং দুর্যোধনের মৃত্যুর জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণই দায়ী। ভীম সেক্ষেত্রে নিমিত্তমাত্র। দুর্যোধনের দুরবস্থা দেখে অশ্বত্থামা ভাবছিলেন— অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা দুর্যোধন কালের প্রকোপেই ওইভাবে পরাভূত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন সোজাসুজি দুর্যোধনকে জিগ্যেস করলেন : "ভোঃ কুরুরাজ! কিমিদম্?" নির্দ্বিধায় তিনি উত্তর দিলেন— "গুরুপুত্র! ফলমপরিতোষস্য।" অন্তরে-বাইরে ক্ষতবিক্ষত দুর্যোধন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যে নতুন এক বোধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এই ঊরুভঙ্গে : ধ্বংসের এবং মৃত্যুর এক সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক চিত্র সম্মুখে তুলে ধরে দুর্যোধন যখন বারবার অশ্বত্থামাকে অস্ত্রত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন, তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে কঠিন বাক্যে আহত করতে ছাড়লেন না, বললেন— "পাণ্ডুপুত্র ভীম গদাঘাতে কেবল আপনার ঊরু দুটিই ভেঙে দেয়নি, দর্পও ভেঙে দিয়েছেন।" একথা শোনামাত্র দুর্যোধন অশ্বত্থামার ভুল ভেঙে দিলেন : "সম্মান নিয়েই তো রাজা, সম্মানই তাঁদের শরীর। সম্মানের স্বার্থেই আমি যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিলাম।"

অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যে নতুন উপলব্ধির আলোকে দুর্যোধন ঘটনাবলিকে নিরীক্ষণ করেছেন, তাইতে পাণ্ডবের প্রতি যে কী নির্মম অত্যাচার ও অমানুষিক আচরণ করা হয়েছে তার তুলনা তিনি এখন খুঁজে পাচ্ছেন না। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণঙ্কাঞ্ছনা, বালক 'পুত্র' অভিমন্যুর নৃশংস হত্যা, পাশার ছলে পাণ্ডবদের হিংস্র বন্য পশুদের সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য করা— প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে তুলনায় যুদ্ধযজ্ঞে ব্রতী পাণ্ডবরা আমার দর্প হরণ করতে কত অল্পই না করেছে— 'নন্বল্পং ময়ি তৈঃ কৃতং বিমৃশ ভো!'

সত্যি বলতে কি, ভাসের সৃষ্ট এই দুর্যোধনের কাছে বীর বালক 'অভিমন্যু' অতিনিবিড় স্নেহের এক গোপন ক্ষত, যার জ্বালা দুর্যোধন তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারেননি। স্বর্গের সুখকর চিত্র যখন মুমূর্ষু দুর্যোধনের দুচোখের সামনে ভেসে উঠছে, তখন তারও মধ্যে এক বিরাট প্রশ্ন— এই অভিমন্যু। অভিমন্যুর হত্যার জন্য দুর্যোধন যে কত অনুতপ্ত এবং এই জঘন্য অপকর্মের জন্য তিনি নিজে যে

নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি, তারই অনুপম প্রকাশ দুর্যোধনের অন্তিম মুহূর্তে ভাসের সাবলীল লেখনীর যাদুতে ঘটেছে : "অয়মপ্যৈরাবতশিরোবিষক্তঃ কাকপক্ষধরো মহেন্দ্রকরতলমবলম্বা ক্রুদ্ধোহভিভাষতে মামভিমন্যুঃ।" দুর্যোধনের চোখে অভিমন্যু স্বর্গে গিয়েও সেই কাকপক্ষধর (কানপাটা বা জুলপিধারী) তরুণ অভিমন্যু। দুর্যোধনকে স্বর্গে আসতে দেখে ক্রোধারুণ মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করেই কী যেন বলছে। অর্থাৎ— অভিমন্যুর অসহায় অকালমৃত্যু ঘটানোর জন্য জবাবদিহি দুর্যোধন এই মুহূর্তে নিজের কাছেই নিজে আরেকভাবে করছেন। শুধু এই একটি স্নিগ্ধ কারুণ্যের দুর্বলতার জন্যই এখানে দুর্যোধন-চরিত্র ভাসের হাতে এক অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। দুর্যোধন-চরিত্রের এই মোহনীয় মানবিকতা অবিস্মরণীয়।

অনুরূপ স্নেহ-বাৎসল্যঘন নিবিড় মানবিকতায় অভিষিক্ত দুর্যোধনের আরেক করুণ সুন্দর পরিচয় আমরা পাই এ নাটকেরই আরেক দৃশ্যে, যেখানে তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁকে খুঁজে খুঁজে ফিরছেন সেই বিবিক্ত প্রান্তরে— "ক্বাসি পুত্র, পুত্রক ক্বাসি" বলে। উঠে যে তিনি পিতামাতার পাদবন্দনা করবেন, সে সামর্থ্যটুকুও ভীম কেড়ে নিয়েছেন। দুর্যোধন তাই বলছেন— "অয়ং মে দ্বিতীয় প্রহারঃ।" স্বামীর শোকে আকুল দুই রানি প্রকাশ্যে খোলা মাথায় রণাঙ্গণে খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুর্যোধনকে। এ দৃশ্যও দুর্যোধনকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু শিশুপুত্র দুর্জয়ের উপস্থিতি বুঝতে পেরে আশঙ্কায় অস্থির হয়েছে তাঁর পিতৃহৃদয়। দুর্জয় তো জগতের পথে এখনও অগ্রসর হয়নি, সে জানে না যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষয়ক্ষতি। সে জানে পিতার কোলে উঠতে। এমত শারীরিক অবস্থাতে দুর্যোধনের স্নেহালু হৃদয় দুর্জয়ের উপস্থিতিতে তাঁকে শতগুণে ক্লিষ্ট করছে (পুত্রস্নেহো হৃদয়ং দহতি।) দুর্জয়ও ঠিক পিতাকে খুঁজে পাওয়ামাত্র তাঁর কোলে চড়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। দুর্যোধন তাকে বারবার বারণ করছেন। কিন্তু অবোধ শিশু বুঝতে পারছে না এ নিষেধের কারণটা কী হতে পারে। সরলভাবে তাই জিগ্যেস করছে— "অঙ্ক উপবেশং কিং নিমিত্তং ত্বং বারয়সি?" এটাই দুর্যোধনের কাছে নিষ্ঠুরতম আঘাত ("most unkindest cut of all")। উত্তর তাঁকে দিতে হল :

"ত্যক্তা পরিচিতং পুত্র। যত্র তত্র ত্বয়াস্যতাম্।
অদ্য প্রভৃতি নাস্তীদং পূর্বভূক্তং তবাসনম্ ॥৪৪॥

অর্থাৎ তুমি বসো পুত্র। আজ থেকে তোমার পূর্বভুক্ত এ আসনটি আর রইল না। জননী গান্ধারীর নিকট দুর্যোধনের প্রার্থনা ভাসের উদ্ভাবনী প্রতিভার আর এক যাদুসৃষ্টি—

"নমস্কৃত্য বদামি ত্বাং যদি পুণ্যং ময়া কৃতম্।
অন্যস্যামপি জাত্যাং মে ত্বমেব জননী ভব" ॥৫০॥

দুর্জয়কে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে ঠিক তেমনি আচরণ করতে বলছেন, যা অভিমন্যু করত। দুর্যোধনের এই আন্তরক্ষতটাকে এত নিপুণভাবে ভাস ছাড়া আর কেউ

দেখাতে পারেননি, অথচ এ নাটকের নাম *উরুভঙ্গ*। দুর্যোধনের আবিষ্কৃত আন্তরক্ষতের কাছে বাইরের এ উরুভঙ্গের ব্যাপারটা যে কত 'বাহ্য' সেটা নামকরণ প্রসঙ্গেও আমরা সূচিত করেছি।

যুদ্ধের সবচাইতে বড় হোতা দুর্যোধন এ নাটকে যেন সর্বকালের যুদ্ধশেষের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা, যাঁকে ভুল বুঝে বলদেব বলেছিলেন, 'অহো বৈরং পশ্চাত্তাপঃ সংবৃত্তঃ।" অশ্বত্থামা নৈশ অন্ধকারে সৌপ্তিকবধের যে প্রস্তাব দুর্যোধনের কাছে করেছিলেন, দুর্যোধন, হ্যাঁ ভাসের *উরুভঙ্গের* দুর্যোধন, ব্যাসের *মহাভারতের* দুর্যোধন নন, সে প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু এই অশ্বত্থামা যখন নিজেই মন্ত্রোচ্চারণ করে দুর্জয়কে বিনা অনুষ্ঠানে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন, তখন দুর্যোধন পরম স্বস্তিতে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন— "হন্ত! কৃতং মে হৃদয়ানুজ্ঞাতম্।" কুরু রাজসিংহাসনে দুর্যোধনের পুত্র দুর্জয় অভিষিক্ত হয়ে পরম্পরা রক্ষা করুক, কিন্তু না, যুদ্ধের রক্তঝরা ঐতিহ্য দিয়ে নয়— এই প্রত্যাশা নিয়েই যেন দুর্যোধন তাঁর নির্মাতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে আনন্দে সঁপে দিতে চললেন— "পরিত্যজন্তীব মে প্রাণাঃ।..." বীরের মৃত্যুর পরে তাঁকে বীরবাহী বিমান কীভাবে এসে নিয়ে যায়, সেই দৃশ্য লেগে রইল দুর্যোধনের নিমীলিতপ্রায় আঁখির কোণে— এ তাঁর আত্ম-সমীক্ষারই প্রতিফলন, নিজের প্রাজ্ঞতার দর্পণে নিজেরই পরিণতির প্রতিভাস, শিল্পীর নিজের লেখনীতে নিজেরই সমালোচনা— "এষ সহস্রহংসপ্রযুক্তো মাং নেতুং বীরবাহী বিমানঃ কালেন প্রেয়িতঃ। অয়ময়মাগচ্ছামি।" নিজের ভিতরের যুদ্ধে দুর্যোধন শেষ মুহূর্তে বিজয়ী এবং সেই বিজয়ের মহিমায় স্বীয় আত্মার সাথে চিরশান্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে তিনি সসম্মানে স্বর্গে গেলেন।

দর্শকের দৃষ্টিতে *উরুভঙ্গ*

মহান্ নাট্যকার ভাসের রচিত এই *উরুভঙ্গ* সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সমগ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এমনটি আর দ্বিতীয় নেই। এ নাটকের বৃত্তান্ত, রূপ, আঙ্গিক, মন্তব্য এবং আস্বাদ্যতা— সব মিলিয়ে এ একটি অভিনব শিল্পকর্ম। নাট্যশাস্ত্রীয় বাঁধনের বেড়াজাল এমন করে আর কোথাও ভাঙা হয়নি।

এ নাটকটি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও একটি সার্থক নাটক, তবে আজকের দিনের সংস্কৃতানুরাগী দর্শকের কাছেও এর ভাষাগত কিছু সরলীকরণ বোধ হয়, অপেক্ষিত। কিন্তু সে যুগের— *মহাভারতীয়* ভাবধারায় পুষ্ট— সংস্কৃতানুশীলন-পরায়ণ দর্শকদের কাছে এ নাটকের ভাষাগত কিছু কাঠিন্য আদৌ হয়তো গ্রাহ্য নয়। ভটদের মুখে সন্নিবিষ্ট সংস্কৃত সংলাপের মধ্যে শব্দাড়ম্বরের তথা সমাসজালের মাধ্যমে রণব্যাপৃত

যোদ্ধাদের আস্ফালন, অস্ত্রোদ্যম এবং রণনির্ঘোষ তথা বিবিধ অস্ত্রের নানাধরনের শব্দের সমাহারে যুদ্ধের একটি স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এতে বোঝা যায়— ভাস শুধু নাট্যকারই নন, তিনি একজন সার্থক কথাশিল্পীও বটেন। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে তিনি ভালোই জানেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎসতা, যুদ্ধের ভয়ালতা, যোদ্ধাদের মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো ভটদের কথায় কথায় দর্শক-মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেটা সর্বাংশে যুদ্ধপ্রীতির অনুকূল নাও হতে পারে। বরং এ নাটকে শুরু থেকেই যেন যুদ্ধকে সামনে রেখে যুদ্ধনিবৃত্তির একটা সূক্ষ্ম প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিষ্কম্ভকের পর থেকে নাটক রীতিমতো জমে ওঠে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে দর্শকের ঔৎসুক্য ও অবধান ধাবিত হয় নাটকের স্বচ্ছন্দ গতিতে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে দেখবার মতো এবং দেখে অভিভূত হবার মতো এ নাটক এ যুগেও সার্থক মঞ্চাভিনয়ের দাবি রাখে। মাত্র কয়েকটি স্থল বাদ দিলে ভাষা এত সাবলীল ও রসানুগুণ যে সহৃদয় দর্শকের বোঝার পক্ষে অনুবাদও অপরিহার্য নয়।

আর সর্বপেক্ষা যেটা আলোচ্য তথা আস্বাদ্য সেটা হল এ নাটকের বিয়োগান্ত ট্র্যাজিক মাধুর্য। কথাটাকে আরো একটু বিশদ করে বললে বলতে হয়— এমন একটি ট্র্যাজেডি সংস্কৃত সাহিত্যে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। সি. আর. দেবধর বলেন : "The *Urubhanga* is a tragedy of Duryodhana's defeat and death." কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসকগণ এত সহজে এটা মেনে নিতে চান না। অনেকে তো *উরুভঙ্গকে* একটি সামগ্রিক নাটক রূপেই মানতে চান না। যেমন Dr. Sukhathankar বলেন : "*Urubhanga* is not a tragedy in one act, but a detached intermediate act of some drama." এঁদের বক্তব্য হল— *উরুভঙ্গ* দুর্যোধনকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁরই পরিণতি ও প্রজ্ঞার কোনো নিটোল নাটক নয়। বৃহত্তর নাট্যকর্মের একটি 'অবান্তর' অংকমাত্র। এরূপ বলার কারণ এই যে, *মহাভারত* ভারতীয় জীবনের গভীরে শিকড় গেড়েছে। তাই প্রথমত *মহাভারত* থেকে স্বতন্ত্র এই নাটকের স্বাদবৈচিত্র্য, দ্বিতীয়ত শুরু থেকে শেষ অবধি দুর্যোধনের অভিনব বোধির এক পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপের এই অসহজাতীয়তা ভারতীয় মনকে কেমন বিস্ময়ের আঘাতে আহত করে, চিরন্তন সংস্কারে ঘা মারে। তখন সেই মন নিয়ে, সেই সংস্কার নিয়ে এ নাটকের রস আস্বাদ করতে গিয়ে কোথায় যেন খটকা লাগে— এ যেন ঠিক এরকম না হলেই হত। অথচ ঠিক কিরকম হবার কথা— তাও ভেবে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এই যে চিরাচরিত আলঙ্কারিক আবেশের প্রাকার ভেঙে নতুন বায়ুর কিছুটা চলাচল, এটা ভাস প্রমুখ মাত্র কয়েকজন নাট্যকারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আর, এই নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনে অগ্রণী ভাস *উরুভঙ্গ* মঞ্চের উপরেই নায়ক দুর্যোধনের মৃত্যু দেখাবার মতো দুঃসাহস রাখেন।

এ নাটকে অ্যারিস্টোটলের সূত্রানুসারে কাহিনীগত ঐক্য (unity of plot), ভয় ও করুণা উদ্রেকে সক্ষম ঘটনা বা serious action, নায়কের বিচারণার ত্রুটিজনিত বিপর্যয়, ছন্দোময় রচনালালিত্য, সংলাপবদ্ধ, কাহিনীর পূর্ণাবয়বতা (complete in itself) এবং সর্বোপরি শ্রোতার মধ্যেকার বিমোক্ষণের ক্ষমতা (catharsis)— এ সবগুলোর সদ্ভাবের দরুন প্রাথমিকভাবেই একে ট্র্যাজেডি রূপে অভিহিত করা যায়। এ ট্র্যাজেডির বিয়োগান্ত নায়ক স্বয়ং দুর্যোধন, কেননা, ট্র্যাজেডি তো তাঁদেরই কাহিনী— "those who have done or suffered something terrible." এ নাটকে আমরা দেখেছি দুর্যোধনের তীব্রতম অন্তর্দ্বন্দ্ব, শ্রেয়োবোধের তাগিদে প্রেয়ের পরিবর্জন কেমনভাবে হৃদয়কে তীব্রতম অনুভূতিতে পরিস্পন্দিত করে।

উরুভঙ্গের দুর্যোধন *মহাভারতের* দুর্যোধনের মতো দুর্বৃত্তমাত্র নন যে তাঁর অনুরূপ পতনে ও মৃত্যুতে কারো ভয় বিস্ময় বা করুণা জাগে না। তাই, দুর্যোধনের শোকাবহ পরিণতি এখানে পাপীর শাস্তিরূপে প্রতিভাত হতে পারে না। Dr. Keith শুধু দুর্যোধনের *মহাভারতীয়* রূপটাই দেখেছেন, ভাস-সৃষ্ট দুর্যোধনকে যথার্থ অনুধাবন করেননি। তাই বলেছেন : "Duryodhana is the chief subject, but not the hero, of the piece which manifests the just punishment of the impious." অবশ্য ভাসের অনুপম সৃষ্টি *উরুভঙ্গের* এই দুর্যোধন-চরিত্রের মৃত্যুর মধ্যে Dr. Keith নায়কোচিত মাহাত্ম্য দেখেছেন : "But Duryodhana, with all his demerits as a man, remains heroic in his death"। ভাবতে অবাক লাগে— Shakespeare-এর নাটকে King Lear-এর মৃত্যু tragic বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা দুর্যোধনের মৃত্যুকে 'পাপের বেতন মৃত্যু' বলে সাহিত্যমীমাংসার সহজ সমাধান টেনে দেন। কিন্তু Lear যেমন কালের রথের চাকা থামাতে পারেন না, কিন্তু নিজের মনের চাকাকে ঘোরাতে শুরু করেন এবং সেই নবপ্রজ্ঞার উন্মেষকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জীবনের অন্তর্বীক্ষণ তথা পরিণতির মানদণ্ডে পরিমাপ করা হয়, তেমনি দুর্যোধন যখন তার আন্তব পরিশোধনের মাধ্যমে নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হন, তখন সে জীবনবোধের বিকশিত হবার তথা শক্তিশালী হবার এবং তার মাধ্যমে চরিত্রের আমূল বিবর্তনের সুযোগ বা সময় আর জোটে না, কেবলই তার নববোধের সম্ভাবনার ব্যঞ্জনা দর্শককে বিমুগ্ধ করে— তখন সেখানে কি বলা যায় না "ripeness was all"?

Dr. Keith যেখানে বলেন দুর্যোধন 'remains heroic in death,' Dr. G. K. Bhat-এর কথায় আমরা তখন বলতে চাই : "What makes Duryodhana a tragic hero is not merely his death but the heroic courage and calm determination with which he accepts his inevitable end."

আর, সব শেষে আমরা এ প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ M. Winternitz-এর মতকে আমাদের মতের প্রতিভূস্থানীয়রূপে উদ্ধৃত করতে চাই : "Of all the indian dramas, this small piece reminds us of the Greek tragedy, and in fact it ends tragically with the words that Duryodhana enters into the heaven.'" "সমস্ত ভারতীয় নাটকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিই কেবল আমাদের গ্রিক্ ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং বাস্তবিক, এ নাটক 'স্বর্গং গতঃ' অর্থাৎ দুর্যোধন স্বর্গে গেলেন— এই বিয়োগান্ত উচ্চারণ দিয়েই সমাপ্ত হয়।"

সদুক্তিরত্ন

"ন দীনং বীরো নিহন্তি সমরেষু— যথার্থ বীর যিনি তিনি বিপন্ন শত্রুকে যুদ্ধে আঘাত করেন না।

"মানশরীরা রাজানঃ"— রাজাদের কাছে সম্মান তাঁদের শরীরের মতোই।

পাত্র-পাত্রী

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভট— তিনজন সৈনিক
দুর্যোধন— কুরুরাজ
বলদেব— বলরাম
ভীম— তৃতীয় পাণ্ডব
দুর্জয়— দুর্যোধনের পুত্র
ধৃতরাষ্ট্র— দুর্যোধনের পিতা
অশ্বত্থামা— দ্রোণাচার্যের পুত্র
গান্ধারী— দুর্যোধনের জননী
দুই দেবী বা দুই রানি— পৌরবী ও মালবী— দুর্যোধনের পত্নী

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দেব

ঊরুভঙ্গম্

[নান্দীশেষে এবারে প্রবেশ করছেন সূত্রধার]

সূত্রধার— ভীষ্ম আর দ্রোণ যার দুটি তীর, জয়দ্রথ যার জল, গান্ধাররাজ (শকুনি) যার আবর্ত, কর্ণ অশ্বত্থামা আর কৃপাচার্য (যথাক্রমে) যার তরঙ্গ, হাঙ্গর এবং ক্রমীর, দুর্যোধন যার স্রোত, শর আর অসি যার সিকতা— শত্রুরূপী সেই নদীকে অর্জুন যে তরণীর সাহায্যে অতিক্রম করেছিলেন, সেই ভগবান্ কেশব শত্রব্যূহের বন্যা অতিক্রমণে আপনাদের (অভয়) তরণী হোন্[১] ॥১॥

মাননীয় মহাশয়দের কাছে আমি এভাবে ঘোষণাটা করছি। আরে, এ আবার কী! আমি ঘোষণাটা করতে যাচ্ছি, আর এর মধ্যেই কী একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে! আচ্ছা, দেখি গিয়ে।

[নেপথ্যে]

ওহে এই যে আমরা, এই যে আমরা।

সূত্রধার— আচ্ছা, বুঝেছি।

(প্রবেশ করে)

মশাই, এরা আবার কেন?

স্বর্গের লোভে যুদ্ধের মুখে (নিজ) অঙ্গ আহুতি দিতে উদ্যত যারা, গাত্র যাদের শত শত নারাচ ও তোমর[২]-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, মত্ত হাতির দাঁতের আঘাতে দেহ যাদের দীর্ণ, পরস্পরের শৌর্যের যারা কষ্টিপাথর— সেই পুরুষেরা এভাবে ঘুরছে কেন? ॥২॥

সূত্রধার— মশাই, বুঝছেন না?

শতপুত্র-নেত্রহীন ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে যখন অবশিষ্ট কেবল দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যখন অবশিষ্ট কেবল পাণ্ডবেরা ও জনার্দন আর রাজাদের শবদেহে যখন সমন্তপঞ্চক[৩] সমাকীর্ণ—

তখন শুরু হল ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, যোদ্ধারা প্রবেশ করল রণক্ষেত্রে যা রাজাদের মৃত্যুর অনন্য নিকেতন; হতাহত হাতি, ঘোড়া, রাজা এবং

যোদ্ধাদের ভিড়ে মনে হচ্ছে এ রণাঙ্গনে যেন এলোমেলো-আলেখ্যের এক ছিন্ন চিত্রপট ॥৩॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

(এরপর তিন সৈনিকের প্রবেশ)

সকলে— এই যে আমরা, এই যে।

প্রথম— আমরা এসেছি এক আশ্রমে— যার এক নাম সংগ্রাম, যা শত্রুতার বাসভূমি, শক্তির পরীক্ষা-ক্ষেত্র, মান ও প্রতিষ্ঠার আশ্রয়; যা অপ্সরাদের যুদ্ধকালীন স্বয়ংবর-সভা, মানুষের শৌর্যের প্রমাণস্থল, রাজাদের অন্তিম সময়ের বীরশয্যা, অগ্নিতে প্রাণাহুতি দানের যজ্ঞ এবং রাজাদের স্বর্গপ্রবেশের সোপান।[৪] ॥৪॥

দ্বিতীয়— ঠিক বলেছেন আপনি।

এই যুদ্ধে পরস্পরের শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ঘটেছে (বীরদের), মৃত মহাহস্তীদের পর্বত-প্রমাণ দেহগুলো পড়ে থাকায় যুদ্ধস্থল রূপ নিয়েছে পার্বত্যভূমির, দিকে দিকে আস্তানা গেড়েছে শকুনিরা; রথগুলো শূন্য, কারণ মহারথীরা ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। ভীষণ যুদ্ধে বহুক্ষণ মুখোমুখি বীরোচিত শস্ত্রচালনা করে পরস্পরের শস্ত্রাঘাতে নিহত রাজারা স্বর্গে গেছেন। ॥৫॥

তৃতীয়— ব্যাপারটা এরকমই।

শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধযজ্ঞ— যা বৈরিতার বহ্নিতে প্রদীপ্ত, বড় বড় হাতির শুঁড়গুলো যার যূপ, ইতস্ততঃ বিন্যস্ত বাণগুলো যার কুশ, মৃত হস্তীদেহগুলো যার সমিধের সঞ্চিত স্তূপ, উড্ডীনপতাকার সমাবেশে যার বিস্তৃত চন্দ্রাতাপ, রণনির্ঘোষ যার উদাত্ত মন্ত্র, আর নিপতিত মানুষগুলো যার উৎসৃষ্ট বলি ॥৬॥

প্রথম— এই আরেকটি দৃশ্য আপনারা (দুজন) দেখুন।

এই যে পাখিগুলো মাংসে ভেজা ঠোঁট দিয়ে পরস্পর শরাঘাতে নিষ্প্রাণ দেহে রণাঙ্গনে ধরাশায়ী রাজাদের অঙ্গ হতে অলঙ্কারগুলো খুলে নিচ্ছে ॥৭॥

দ্বিতীয়— সমস্ত প্রকার যুদ্ধোদ্যমের জন্য প্রস্তুত সুসজ্জিত যে হাতি তীরধনুকের[৫] সম্ভারসহ রাজার অস্ত্রাগারের মতো শোভা পাচ্ছিল, তার বর্ম বিধ্বস্ত হওয়ায় সে এখন ঝাঁক ঝাঁক 'নারাচ'-বাণবর্ষণে অবসন্ন হয়ে পড়ছে ॥৮॥

তৃতীয়— এদিকে আরেক দৃশ্য দেখুন।

পতাকার ওপর থেকে খসে-পড়া মালায় রচিত যার শিরোভূষণ, সুতীক্ষ্ণ অমোঘ সায়কে সংলগ্ন যার শরীর, নিয়ত সেই রথীকে রথাগ্র থেকে

হৃষ্ট শৃগালীরা টেনে নামাচ্ছে যেমন বন্ধুনারীরা জামাতাকে পালকি থেকে টেনে নামায়[৬] ॥৯॥

সকলে— উহ্, কী ভয়াল এই সমন্তপঞ্চক— যার ভূমি নিহত ও পতিত গজ, অশ্ব ও মানুষের রক্তে ক্লিন্ন; যার চারদিক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বর্ম, ঢাল, ছত্র, চামর, তোমর, শর, কুন্ত, কবচ ও কবন্ধে ভরে গেছে; যা শক্তি, প্রাস, পরশু, ভিন্দিপাল, শূল, মুসল, মুদ্গর, বরাহকর্ণ, কণপ, কর্পণ, শঙ্কু, ত্রাসি-গদা প্রভৃতি আয়ুধে সমাকীর্ণ।[৭]

প্রথম— এখানে তো—

মৃত হাতিগুলোর ওপর দিয়ে রক্তের নদী পারাপার করছে, জীবিত যোদ্ধারা, রাজা নেই, সারথিও পড়ে গেছেন, সেই রথগুলোকে টানছে ঘোড়ারা। পূর্বাভ্যাসবশে মুণ্ডহীন ধড়গুলো (এখনও) চলমান। মাহুতহীন মত্ত হাতিগুলো যেখানে ছোটাছুটি করছে ॥১০॥

দ্বিতীয়— এই আর এক দৃশ্য দেখুন—

এই যে শকুনগুলো— চোখগুলো যাদের মহুয়ার কালির মতো বড় বড় এবং কটা, ঠোঁটগুলো যাদের দৈত্যরাজ বলির হাতির জন্য বাঁকা অঙ্কুশের মতো তীক্ষ্ণ, বিশালকায় লম্বা লম্বা পাখাগুলো মেলে ধরে আকাশে ভাসছে— এখানে-ওখানে মাংসের টুকরো লেগে থাকায় দেখাচ্ছে যেন প্রবাল -বসানো তালপাখা ॥১১॥

তৃতীয়— সূর্যের প্রখর কিরণে এই রণভূমির চতুর্দিকে মৃত অশ্ব, গজ, নৃপ ও যোদ্ধাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর নারাচ, কুন্ত, শর, তোমর এবং খড়গ— পরিব্যাপ্ত ভূভাগ এমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে, যেন আকাশ-থেকে-খসে-পড়া তারাগুলোকে পৃথিবী এখানে ধরে রেখেছে ॥১২॥

প্রথম— আহা! এহেন অবস্থাতেও ক্ষত্রিয়েরা অটুট শোভায় বিরাজমান। কেননা এখানে—

রাজাদের নির্ভীক মুখে নিষ্কম্প স্থলপদ্মের সৌসাদৃশ্য, কোটর-থেকে-বেরিয়ে-আসা চোখ ভ্রমর, রক্তিম ওষ্ঠাধর কিশলয়, ভ্রূভঙ্গ কমনীয় কেসর, মুকুট কিঞ্চিৎ-বিকশিত নবদল— বীর্যরূপ সূর্যের প্রকাশে এ পদ্ম প্রস্ফুটিত এবং নারাচ-নালে উদ্ধৃত ॥১৩॥

দ্বিতীয়— এরকম সব ক্ষত্রিয়ের ওপরেও মৃত্যু তার প্রভাব কার্যকর করেছে। বিপদে পড়লে মানুষ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

তৃতীয়— মৃত্যুই ক্ষত্রিয়দের সংহার করে।

প্রথম— সন্দেহ কি?

দ্বিতীয়— না, না, আপনি এরূপ বলবেন না।

খাণ্ডবদাহের ধূমে ধূসর যে ধনুকের জ্যা, যে ধনুক সংশপ্তকদের উৎসাদন করেছিল, যে ধনুক স্বর্গেব আর্তনাদ প্রশমিত করেছিল, যে ধনুক উপহারস্বরূপ গ্রহণ করেছিল নিবাত-কবচদের প্রাণ, সেই ধনুক ধারণ করে মহেশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে অব্যবহৃত শরসন্ধান করে অর্জুন আজ সংগ্রামের সূচনাতে দর্পোদ্ধত রাজাদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছেন।[৮] ॥১৪॥

সকলে— ওহ্, কী শব্দ!

মেঘেরা কি গর্জন করছে? অথবা অশনি-সম্পাতে পর্বতগুলো চূর্ণীকৃত হচ্ছে? কিংবা, তুমুল শব্দোৎপাদী ভয়ঙ্কর বায়ুসংঘাতে ধরণী বিদীর্ণ হচ্ছে? অথবা মন্দরপর্বতের নিভৃত কন্দরগুলোর বিরুদ্ধে যার বায়ুতাড়িত চঞ্চল ক্ষুব্ধ উর্মিমালা অভিঘাতে মুখর, সেই সাগর কি গর্জে উঠছে? ॥১৫॥

আচ্ছা, দেখাই যাক। (সকলের পরিক্রমণ)

প্রথম— ও, ওদিকে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এবং মহারাজ দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে—

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের ফলে ক্রোধে উদ্দীপ্ত ভীমসেন, আর শত ভ্রাতার নিধনহেতু ক্ষিপ্ত দুর্যোধন; ফরুকুল ও যদুবংশের পূজ্য অভিভাবক ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখের সম্মুখে শুরু হয়েছে এই গদাযুদ্ধ।

দ্বিতীয়— ভীমসেনের তপ্ত কাঞ্চনশিলার মতো পুষ্ট আয়ত বক্ষে যখন গদার আঘাত নেমে আসছে এবং দুর্যোধনের ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ কঠিন স্কন্ধ যখন গদার আঘাতে শিথিল হয়ে পড়ছে, তখন এঁদের পরস্পরের বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থলে গদাদ্বয়ের প্রচণ্ড সংঘাতেই উত্থিত হচ্ছে এই শব্দ। ॥১৬॥

তৃতীয়— এই যে মহারাজ—

বারংবার মাথা কাঁপার জন্য যার শিরস্ত্রাণ দুলে দুলে উঠছে, যাঁর মুখে ক্রোধে বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় জ্বলজ্বল করছে, অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর শরীরও বেঁকে যাচ্ছে, আর ক্ষণে ক্ষণে হাত ওঠানামা করছে। তাঁর দক্ষিণ করাগ্রে ধৃত গদা শত্রুর রক্তে ক্লেদাক্ত, দেখাচ্ছে যেন কৈলাসপর্বতের শিখর থেকে প্রক্ষিপ্ত ইন্দ্রের ভাস্বর বজ্র। ॥১৭॥

প্রথম— গদার প্রহারে প্রহারে রুধিরসিক্তাঙ্গ পাণ্ডবকে এদিকে দেখুন।

কপালের সামনেটা গেছে ফেটে, ঝরছে রক্ত; পাহাড়ের চূড়ার মতো কাঁধ দুটি গেছে ভেঙে, ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তে বুক গেছে ভিজে; গদার আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতগুলো রক্তে আর্দ্র— ভীমকে দেখাচ্ছে মেরুপর্বতের মতো যার শিলাদেহ থেকে গৈরিকধাতুমিশ্র জলের ধারা নির্গত হচ্ছে। ॥১৮॥

দ্বিতীয়— (মহারাজ দুর্যোধন) ভয়াল গদা নিক্ষেপ করছেন, উল্লম্ফনের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করছেন, (শত্রুর আঘাতের মুখ থেকে) ত্বরিতে নিজ বাহু সরিয়ে নিচ্ছেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছেন, পুনর্বার বিশেষ ভঙ্গীতে আক্রমণে উদ্যত হচ্ছেন— একের পর এক আঘাত করেই চলেছেন। গদাযুদ্ধের শিক্ষা মহারাজের আছে, কিন্তু ভীমসেন বলবান্[৯]। ॥১৯॥

তৃতীয়— এই-যে—

যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য পর্বতোপম বৃকোদর এখন মাটিতে ঢলে পড়ছেন,— মাথার গভীর ক্ষত থেকে ফিনকি দেওয়া রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর দেহ— যেন বজ্রদগ্ধ গিরিরাজ মেরু মেদিনীতে বসে যাচ্ছে, আর স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে তার বিগলিত খনিজ ধাতু। ॥২০॥

প্রথম— প্রচণ্ড আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ায় ভীমসেন পড়ে যাচ্ছেন। তা দেখে ব্যাসদেব বিস্মিত, এক অঙ্গুলির অগ্রভাগে ন্যস্ত তাঁর উদগ্র আনন।

দ্বিতীয়— যুধিষ্ঠির বিব্রত, বিদুর বাষ্পাকুল।

তৃতীয়— অর্জুন তুলে নিয়েছেন গাণ্ডীব, কৃষ্ণ তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে।

সকলে— যুদ্ধ দেখতে দেখতে বলরাম শিষ্যের (দুর্যোধনের) প্রতি প্রীতিবশে লাঙল ঘোরাচ্ছেন। ॥২১॥

প্রথম— এই-যে মহারাজ—

অভিমান, সৌজন্য, সাহস আর তেজে ভরপুর, বীরত্বের আবাসস্থল, বিবিধ রত্নের বৈচিত্র্যে ভূষিত মুকুটমণ্ডিত যিনি হাসতে হাসতে এরকম বলছিলেন— "ওহে ভীম, বীরপুরুষ কখনও যুদ্ধে বিপন্নকে আঘাত করেন না,[১০] ভয় ত্যাগ কর।" ॥২২॥

দ্বিতীয়— এইমাত্র জনার্দন এমনি বিদ্রূপে ভীমসেনকে জর্জর হতে দেখে নিজ উরুতে আঘাত করে কী যেন ইঙ্গিত করলেন।

তৃতীয়— এবং এই ইঙ্গিতে ভীমসেন অনুপ্রাণিত হলেন।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে, ললাটবিবরের স্বেদবিন্দু হাত দিয়ে মুছে ফেলে, মুখভাব কঠিন করে নিজ গদা চিত্রাঙ্গদাকে দু বাহু বাড়িয়ে ধরলেন এবং হুঙ্কার করতে করতে মাটি থেকে আবার উঠে দাঁড়ালেন— চোখ দুটো তাঁর দৃপ্ত সিংহরাজের চোখের মতো জ্বলছে; মনে হচ্ছে পুত্রের দীন দশা দেখে পবনদেব তাঁকে শক্তি দিয়েছেন। ॥২৩॥

প্রথম— এই যে, আবার আরম্ভ হয়েছে গদাযুদ্ধ! এই পাণ্ডুপুত্র ভূমিতে দুই করতল ঘর্ষণ করে, সজোরে দুবাহুকে যথেষ্ট মর্দন করে, ওষ্ঠ দংশন করে বিক্রমবশে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করতে করতে ধর্মনীতি এমনকি যুদ্ধনীতিও

বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র দুর্যোধনের উরুতে গদাপ্রহার করলেন। ॥২৪॥

সকলে— হা ধিক, মহারাজ ভূপতিত।

তৃতীয়— রক্তধারার মাঝে অঙ্গগুলোকে কোনোমতে চেনা যাচ্ছে,— এমতাবস্থায় কুরুরাজকে পড়ে যেতে দেখে ভগবান্ দ্বৈপায়ন আকাশে উঠে গেলেন। অপমানে[১১] অবরুদ্ধ হয়েছে বলরামের দৃষ্টি, চোখ তিনি তাই খুলছেন না; দুর্যোধনের জন্য বলরামকে ক্রোধে মুদ্রিতনেত্র দেখে সন্ত্রস্ত পাণ্ডবগণ ব্যাসের নির্দেশমতো বাহুপঞ্জরে সুরক্ষিত করে ভীমকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন— এবং ভীম তাঁর নিষ্ক্রমণে কৃষ্ণের বাহুর উপর ভর করে রয়েছেন। ॥২৫॥

প্রথম— আরে, ক্রোধে বিস্ফারিতনেত্র ভগবান্ হলায়ুধ ভীমসেনের নিষ্ক্রমণ দেখতে দেখতে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। এই যে—

আন্দোলনে চঞ্চল যাঁর মাথার মুকুট, ক্রোধে রক্তবর্ণ যাঁর আয়ত নয়নযুগল, ভ্রমরমুখচুম্বিত মালাটাকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করে, অঙ্গে বিলম্বিত স্রস্ত নীলবসন সংযত করে, ভূতলাবতীর্ণ মেঘবেষ্টিত চন্দ্রের মতো তিনি শোভা পাচ্ছেন। ॥২৬॥

দ্বিতীয়— আসুন তবে, আমরাও মহারাজের কাছাকাছি যাই।

উভয়ে— বেশ, উত্তম প্রস্তাব।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

[অতঃপর বলদেবের (বলরামের) প্রবেশ]

বলদেব— শুনুন শুনুন নৃপগণ, এটা সমীচীন হচ্ছে না।

শত্রুশক্তির কালস্বরূপ আমার হলকে উপেক্ষা করে, যুদ্ধের রীতিনীতির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, আমার উপস্থিতিকে অমর্যাদা করে, দর্পের বশে সে যুদ্ধের মুখে দুর্যোধনের উরুদ্বয়ে[১২] গদাঘাত করে কুরুবংশের সদাচারের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনকে ভূমিসাৎ করেছে। ॥২৭॥

ওহে দুর্যোধন, এক মুহূর্ত নিজেকে ধরে রাখ।

যা সৌভনগরীর দ্বার বিধ্বস্ত করেছে, যা মহাসুরের রাজপুরীর চার প্রাকারকে অঙ্কুশের মতো আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করেছে, যা যমুনার জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত করেছে, যা শত্রুসৈন্যের প্রাণের নৈবেদ্যে সম্মানিত, সেই হলকে আজ আমি ভীমের বিশাল বক্ষে সদ্যঃ শোণিত স্বেদসিক্ত পঙ্কিল কৃষিরেখা উৎপাদনে নিযুক্ত করব।[১৩] ॥২৮॥

[নেপথ্যে]

প্রসন্ন হোন্ প্রসন্ন হোন, ভগবান্ হলায়ুধ!

বলদেব— আহা! এমন দশায় পড়েও হতভাগ্য দুর্যোধন (সসম্মানে) আমার অনুগমন করছে।

যুদ্ধের চন্দনস্বরূপ রুধিরে রুধিরে সিক্ত ও অনুলিপ্ত যার দেহ, মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলার দরুন ধূলিমলিন যার দুটি বাহু, সেই শ্রীমান্‌কে শিশুর ভূমিকা নিতে হয়েছে! দেখে মনে হচ্ছে— সে হল সেই বাসুকি অমৃতমন্থন শেষে দেবাসুরেরা (মন্দার) পর্বত থেকে মুক্ত করে দিলে সে শ্রান্ত শিথিল দেহটাকে সাগরের জলে কোনোমতে টেনে নিয়েছিল। ॥২৯॥

[অতঃপর দুই ভগ্ন উরু নিয়ে দুর্যোধনের প্রবেশ]

দুর্যোধন— এই যে—

যুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত প্রথা লঙ্ঘন করে ভীম গদাঘাতে আমার দুটি উরুকে ক্ষতবিক্ষত ও ভগ্ন করেছে; সেই আমি মৃতপ্রায় নিজের দেহটাকে দুবাহুর সাহায্যে ভূমিতে টেনে টেনে বহন করছি। ॥৩০॥

প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন ভগবান্ হলায়ুধ!

ভূপতিত আমার মস্তক আপনার দুটি চরণে আনত! সর্বাগ্রে আপনি আজ আপনার ক্রোধ ত্যাগ করুন— যাতে কুরুকুলের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে— তর্পণবারি বর্ষণের জন্য (পাণ্ডবরূপী) মেঘেরা জীবিত থাকে। শত্রুতা, যুদ্ধকথা এবং আমরা— সব শেষ! ॥৩১॥

বলদেব— ওহে দুর্যোধন, (আর) এক মুহূর্ত নিজেকে ধরে রাখো!

দুর্যোধন— কী আপনি করবেন?

বলদেব— শোন, তবে—

লাঙ্গল চালনা করে তার ফলায় দেহ ক্ষতবিক্ষত করে, মুসলপ্রহারে স্কন্ধ ও হৃদয় বিদীর্ণ করে— রথ, অশ্ব, গজসহ পাণ্ডুপুত্রদের যুদ্ধে নিহত করে স্বর্গের সহযাত্রীরূপে তোমার কাছে এনে দেব। ॥৩২॥

দুর্যোধন— না, না, আপনি একথা বলবেন না।

ভীম তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছে, আমার শত ভ্রাতা স্বর্গে প্রয়াত, আর আমার যখন এই দশা, তখন হে রাম, বিগ্রহে কী কাজ? ॥৩৩॥

বলদেব— আমার সম্মুখে তোমাকে বঞ্চনা করা হল, তাইতেই আমার ক্রোধ।

দুর্যোধন— আমি বঞ্চিত— এটাই তবে আপনি মনে করেন?

বলদেব— সন্দেহ কী?

দুর্যোধন— আহ্, কী আনন্দ! আমার প্রাণের মূল্য, বোধ হয়, পেয়ে গেছি। কারণ—
হে প্রভু বলরাম, চারদিকে জাজ্বল্যমান অগ্নির আবেষ্টনে ভয়ঙ্কর জতুগৃহ থেকে নিজবুদ্ধিতে যে নিজেকে উদ্ধার করেছে, কুবের-আলয়ে যুদ্ধকালে যে দারুণ বেগে পর্বতশিলা নিক্ষেপ করেছে, সেখানে যে হিড়িম্বনামক রাক্ষসপতির প্রাণ হরণ করেছে, সেই ভীমসেন আমাকে শঠতায় পরাস্ত করেছে বলে যদি আপনি মনে করেন, তবে জেনে রাখুন, আমি পরাস্ত হইনি[১৪] ॥৩৪॥

বলদেব— সম্প্রতি তোমাকে যুদ্ধে বঞ্চনা করার পর ভীমসেন জীবিত থাকবে?

দুর্যোধন— কিন্তু আমি কি ভীমসেনের ছলনার শিকার হয়েছি?

বলদেব— কে তবে তোমার এই দশা করেছে?

দুর্যোধন— শুনুন—
যিনি ইন্দ্রের মানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পারিজাত তরুও হরণ করেছিলেন, যিনি সহস্র দিব্য বর্ষ সাগরজলে যোগলীলায় শয়ন করেছিলেন, জগতের প্রিয় সেই হরি সহসা ভীমের ভয়াল গদায় প্রবেশ করে অকপট-যুদ্ধপ্রেমী আমাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছেন। ॥৩৫॥
[নেপথ্যে]
সরে যান, সরে যান মশাইরা, সরে যান।

বলদেব— (দেখে) হায় হায়! শোকসন্তপ্তহৃদয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীসমেত এদিকেই আসছেন; পথ দেখিয়ে দিচ্ছে দুর্জয়, আর পেছন পেছন আসছেন অন্তঃপুরবাসিনীরা।
ইনিই তো সেই পুরুষ— যিনি শৌর্যের আকর, দৃষ্টিশক্তি যাঁর শতপুত্রে বিভক্ত[১৫], অহঙ্কারে যিনি স্ফীত, যাঁর দুটি বাহু স্বর্ণস্তম্ভসদৃশ; নিশ্চয়ই স্বর্গ রক্ষার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে দেবগণ শত্রুরূপ অন্ধকারে রুদ্ধদৃষ্টি করে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। ॥৩৬॥

[অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দুই রানি ও দুর্জয়ের প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র— কোথায় তুমি, পুত্র?

গান্ধারী— পুত্র, তুমি কোথায়?

দুই রানি— মহারাজ, আপনি কোথায়?

ধৃতরাষ্ট্র— ওঃ, কী কষ্ট!
যুদ্ধে আজ কপটতা করে পুত্রকে আমার পর্যুদস্ত করেছে শুনে আমার চোখ জলে ভরে যাওয়ায় অন্ধ নয়ন আরো অন্ধ হয়ে গেছে। ॥৩৭॥
বেঁচে আছ কি, গান্ধারী?

গান্ধারী— ভাগ্য যে মন্দ, তাই বেঁচে আছি।

দুই রানি— মহারাজ! মহারাজ!

দুর্যোধন— হায়! কী কষ্ট! আমার রানিরাও যে কাঁদছে!

পূর্বে আমি গদাঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে অনুভব করছি, কারণ আমার অন্তঃপুরবাসিনী এই রানিরা অবগুণ্ঠনহীন আলুলায়িতকুন্তলে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে! ॥৩৮॥

ধৃতরাষ্ট্র— বংশাভিমানী দুর্যোধনকে কি দেখা যাচ্ছে?

গান্ধারী— দেখা যাচ্ছে না, মহারাজ।

ধৃতরাষ্ট্র— কেন দেখা যাচ্ছে না? হায়, হায়! অন্ধ আমি এখনও বেঁচে আছি আর অন্বেষণকালে পুত্রকে খুঁজে পাচ্ছি না! হে দুরন্ত কৃতান্ত!

যুদ্ধক্ষেত্রে দেহগুলো সম্প্রতি যাদের ছড়িয়ে আছে, সেই অরিন্দম, মান-বীর্যপ্রদীপ্ত, অতিসাহসী এবং বীর শত পুত্রের জন্ম দিয়ে মানী ধৃতরাষ্ট্র কি একটি বারের জন্যও পুত্রার্পিত তর্পণবারি পাবার যোগ্য নন?

গান্ধারী— বৎস দুর্যোধন, আমার কথার উত্তর দাও।

শত পুত্র হারাবার শোকে আত্মহারা মহারাজকে আশ্বস্ত কর।

বলদেব— তাইতো! এই যে মাননীয়া গান্ধারী—

যিনি চোখ খুলে পুত্র-পৌত্রদের মুখদর্শনে কৌতূহলী হননি, দুর্যোধনের পতনজনিত শোকে তাঁর আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, পতিভক্তির পরিচায়ক স্বেচ্ছাধৃত নয়ন-বন্ধন তাই তাঁর আজ অজস্র অশ্রুধারায় সিক্ত। ॥৪০॥

ধৃতরাষ্ট্র— পুত্র দুর্যোধন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর কোথায় তুমি?

দুর্যোধন— আজ আমি অধীশ্বরই বটে!

ধৃতরাষ্ট্র— হে পুত্রশতাগ্রজ! তুমি এস। আমার কথার উত্তর দাও।

দুর্যোধন— উত্তর ঠিকই দেব। এই যে ব্যাপারটা ঘটেছে, এতে আমি লজ্জিত।

ধৃতরাষ্ট্র— এস পুত্র, অভিবাদন কর আমাকে।

দুর্যোধন— এই আমি আসছি। (ওঠার অভিনয়— পতন) হা ধিক্! এ আমার দ্বিতীয় আঘাত। উহ্, কী কষ্ট!

কেশাকর্ষণ করে আমার দেহে গদা প্রহার করে ভীমসেন যে কেবল আমার দুটি ঊরুকে অকর্মণ্য করেছে— তা নয়, সে আমার পিতার চরণে প্রণিপাতের ক্ষমতাও হরণ করেছে। ॥৪১॥

গান্ধারী— বৎসে, এখানে।

দুই রানি— আর্যে, এই-যে আমরা।

গান্ধারী— স্বামীকে খোঁজ।

দুই রানি— হতভাগিনী আমরা যাচ্ছি।

ধৃতরাষ্ট্র— ওহো! কে আমার বসন-প্রান্ত আকর্ষণ করে আমায় পথনির্দেশ করছে?

দুর্জয়— তাত, আমি দুর্জয়।

ধৃতরাষ্ট্র— পৌত্র দুর্জয়, পিতাকে খোঁজ।

দুর্জয়— আমি যে পরিশ্রান্ত, তাত।

ধৃতরাষ্ট্র— যাও পিতার কোলে বিশ্রাম কর।

দুর্জয়— তাত, আমি যাচ্ছি।

(এগিয়ে গিয়ে)

পিতঃ তুমি কোথায়?

দুর্যোধন— এ-ও এসেছে! ওহ্, সর্বাবস্থাতেই হৃদয়ে নিহিত পুত্রস্নেহ আমাকে দহন করছে। কারণ—

দুঃখকষ্টের পরিচয়হীন, আমার কোলে শয়ন করতে অভ্যস্ত দুর্জয় আমাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত দেখে কি না জানি বলবে? ॥৪২॥

দুর্জয়— এই যে মহারাজ মাটিতে বসে রয়েছেন।

দুর্যোধন— বৎস, কী জন্য এখানে এসেছ?

দুর্জয়— তুমি যে দেরি করছ, তাই।

দুর্যোধন— হায়! এমন অবস্থাতেও পুত্রস্নেহ হৃদয়কে ব্যাকুল করছে।

দুর্জয়— আমি কিন্তু তোমার কোলে বসব।

(কোলে উঠতে যায়)

দুর্যোধন— (নিষেধ করে) দুর্জয়, দুর্জয়! উহ্, কী কষ্ট! যে আমার অন্তরের আনন্দের উৎস, যে আমার নয়নের উৎসব, সেই চন্দ্র আজ কালের প্রভাবে অগ্নির রূপ নিয়েছে[১৬] ॥৪৩॥

দুর্জয়— কেন তুমি আমাকে কোলে উঠতে বারণ করছ?

দুর্যোধন— তোমার অভ্যস্ত এই আসনটি ছাড়া আর যেখানে হোক তুমি বসতে পার। আহ্ পুত্র, আজ থেকে তোমার পূর্বের অধিকৃত এই আসনটি আর রইল না। ॥৪৪॥

দুর্জয়— মহারাজ! তুমি কি কোথাও যাবে?

দুর্যোধন— আমি শত ভ্রাতার অনুগমন করব বৎস!

দুর্জয়— আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও।

দুর্যোধন— যাও পুত্র, একথা ভীমকে বল।

দুর্জয়— এস, মহারাজ তোমাকে খুঁজছেন।

দুর্যোধন— পুত্র, কে খুঁজছেন?

দুর্জয়— পিতামহ, পিতামহী এবং অন্তঃপুরের সবাই।

দুর্যোধন— যাও পুত্র, আমার উঠে যাবার শক্তি নেই।

দুর্জয়— আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

দুর্যোধন— তুমি যে এখনও ছোট, বৎস।

দুর্জয়— (পরিক্রমণ করে) আর্যা, এই যে মহারাজ!

দুই রানি— আহা, মহারাজ!

ধৃতরাষ্ট্র— কই সে মহারাজ?

গান্ধারী— কোথা পুত্র মোর?

দুর্জয়— এই যে মহারাজ মাটিতে বসে রয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র— হায়, তবে এই কি মহারাজ!

ভূলোকে যে ছিল অদ্বিতীয় রাজার রাজা, দেহসৌষ্ঠবে যে ছিল সুবর্ণস্তম্ভের সমতুল, সে এখন ভূমিতে নিপাতিত এক অসহায় দীন— বৃহৎ কোনো দ্বারের ভগ্ন কীলকের মতোই তার আকৃতি। ॥৪৫॥

গান্ধারী— বৎস দুর্যোধন, পরিশ্রান্ত হয়েছ?

দুর্যোধন— আমি তো আপনারই পুত্র।

ধৃতরাষ্ট্র— ওহে, ইনি কে?

গান্ধারী— মহারাজ, আমি নির্ভীক পুত্রের গর্ভধারিণী।

দুর্যোধন— আজই যেন আমার জন্ম হল, মনে হচ্ছে।

তবে তাত! আজ শোকে কাজ কী?

ধৃতরাষ্ট্র— পুত্র, কেমন করে আমি শোকমুক্ত হব?

যার শৌর্যে তেজে দৃপ্ত, যুদ্ধযজ্ঞে দীক্ষিত শত ভ্রাতা পূর্বেই নিহত হয়েছে, একমাত্র অবিশিষ্ট সেই তোমার নিধনে সব শেষ হয়ে গেল। ৪৬॥

(পড়ে গেলেন)

দুর্যোধন— হা ধিক্। ইনি পড়ে গেলেন। তাত, আপনিই যে মাতাকে আশ্বস্ত করবেন!

ধৃতরাষ্ট্র— পুত্র, কী বলে আমি আশ্বস্ত করব?

দুর্যোধন— সম্মুখযুদ্ধে হত হয়েছি— এই বলে।

হ্যাঁ, তাত! শোক সংযত করে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেবল আপনারই পায়ে কপাল নুয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকে পর্যন্ত চিন্তায় ঠাঁই না দিয়ে যে সম্মান নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম, সে সম্মান নিয়েই আমি স্বর্গে যেতে চাই। ॥৪৭॥

ধৃতরাষ্ট্র— আমি বৃদ্ধ, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ, আমি জন্মান্ধ! আমার অন্তরে উৎপন্ন নিদারুণ পুত্রশোক আমার ধৈর্য নাশ করে আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। ॥৪৮॥

বলদেব— সত্যি, কী কষ্ট!

দুর্যোধনের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ, চিররুদ্ধদৃষ্টি এঁর কাছে আমি আমার উপস্থিতির কথা নিবেদন করতে পারছি না। ॥৪৯॥

দুর্যোধন— মাতঃ, আপনাকে একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

গান্ধারী— বল, বৎস।

দুর্যোধন— আপনাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করছি :

যদি আমি কোনো পুণ্য করে থাকি, জন্মান্তরেও আপনিই আমার জননী হোন্ ॥৫০॥

গান্ধারী— আমার মনোগত ইচ্ছাই তুমি ব্যক্ত করেছ।

দুর্যোধন— মালবী, তুমিও শোন।

ভয়াবহ যুদ্ধে গদার আঘাতে ঘটেছে আমার এই উরুভঙ্গ! ভ্রুভঙ্গ, বক্ষের ক্ষতস্থান থেকে ক্ষরিত রক্ত রাখেনি বক্ষে হারের জন্য কোনো অবকাশ, আর আমার ব্রণ রূপ কাঞ্চন অঙ্গদধারী অতি-সুন্দর এই বাহুযুগল দেখ; তোমার পতি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে তো হত হননি, হে ক্ষত্রনারী, রোদন করছ কেন? ॥৫১॥

মালবী— আপনার সহধর্মচারিণী হলেও বয়স আমার কম, তাই কাঁদছি।

দুর্যোধন— পৌরবী, তুমিও শোন।

বেদোক্ত বিবিধ যজ্ঞ আমি যথাবিধি অনুষ্ঠান করেছি, স্বজন-বন্ধুদের ভরণ করেছি, শত্রুদের মস্তকে অধিষ্ঠান করেছি, আশ্রিতদের শত প্রেয়োলাভ থেকে বঞ্চিত করিনি, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর নায়ক রাজাদের কারারুদ্ধ করেছি।[১৭] সুতরাং আমার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে, হে মানিনী, এমন পুরুষের স্ত্রীদের রোদন করার কথা নয়। ॥৫২॥

পৌরবী— একই সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশের সংকল্পে আমি স্থির, তাই কাঁদছি না।[১৮]

দুর্যোধন— দুর্জয়, তুমিও শোন।

ধৃতরাষ্ট্র— গান্ধারী, কী না জানি সে বলে?

গান্ধারী— আমিও সেটাই ভাবছি।

দুর্যোধন— আমার মতো পাণ্ডবদের সেবা করবে, পূজ্যা মাতা কুন্তীর আজ্ঞা পালন করবে। অভিমন্যু-জননী (সুভদ্রা) এবং দ্রৌপদী— উভয়কেই মাতৃবৎ সম্মান করবে। দেখ পুত্র,

এই ভেবে তুমি শোক ত্যাগ কর যে, যাঁর সমৃদ্ধি সকলের শ্লাঘা অর্জন করেছিল, আত্ম-মানে যাঁর চিত্ত ছিল দীপ্ত, তিনি,— আমার পিতা দুর্যোধন, সমকক্ষ বীরের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে হত হয়েছেন। আমার দেহাবসানে তুমি

যুধিষ্ঠিরের ক্ষৌমবস্ত্রে-আচ্ছাদিত দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে তিলাঞ্জলি দান করো। ॥৫৩॥

বলদেব— অহো! শত্রুতা পরিণত হয়েছে অনুতাপে। একি! একটা শব্দ না! যুদ্ধের সেই সাজ-সাজ রব নেই, থেমে গেছে কখন দুন্দুভিনাদ, রণভূমি নিস্তব্ধ। ছড়িয়ে আছে ইতস্তত বাণ, বর্ম, চামর ও ছত্র। পড়ে আছে নিহত সারথি ও যোদ্ধা। এই অবস্থায় কার ধনুকটঙ্কার সন্ত্রস্ত ভ্রাম্যমাণ ঝাঁক-ঝাঁক কাকে আকাশ ভরিয়ে তুলেছে? ॥৫৪॥

(নেপথ্যে)

জ্যাসম্বলিত-ধনুকধারী দুর্যোধনের সঙ্গে একত্র আমি যে যুদ্ধযজ্ঞে প্রবেশ করেছিলাম, সম্প্রতি শূন্য হলেও সেখানেই পুনর্বার প্রবেশ করছি, অধ্বর্যু-সম্পাদিত[১৯] অশ্বমেধ শেষ হয়ে গেলেও লোকে যেমন সেখানে প্রবেশ করে। ॥৫৫॥

বলদেব— তাই তো! এ-যে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা এদিকেই আসছেন। হ্যাঁ, ইনি সেই পুরুষ যাঁর—

নয়নযুগল বিকচ-কমল-দলের ন্যায় পরিস্ফুট এবং আয়ত; যাঁর বাহুদ্বয় উজ্জ্বল স্বর্ণযূপের মতো সুঠাম ও দীর্ঘ। সুদৃঢ় ধনুকখানি সজোরে আকর্ষণ করার মুহূর্তে তাঁকে শুঙ্গ-লগ্ন-ইন্দ্রধনুমণ্ডিত প্রদীপ্ত মেরুগিরির মতো মনে হচ্ছে। ॥৫৬॥

[অতঃপর অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা— [পূর্বোক্ত ('জ্যাসম্বলিত ধনুকধারী...' ইত্যাদি) শ্লোকেরই পুনরাবৃত্তি করে] ওহে যুদ্ধপ্রেমিক নৃপতিবৃন্দ! আপনাদের শরীর যুদ্ধোৎসাহের ব্যগ্রতায় উভয়পক্ষের সেনারূপ সমুদ্রের সঙ্গমসময়ে সমুত্থিত শস্ত্ররূপ কুমিরের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন. জীবনের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে আপনাদের, অতিক্ষীণ প্রাণবায়ু রুদ্ধপ্রায়। শুনুন, শুনুন আপনারা।

ছলনার আশ্রয়ে দলিত করা হয়েছে যাঁর উরুদ্বয়, সেই কুরুরাজ দুর্যোধন আমি নই; যাঁর শস্ত্র (চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে) শিথিল ও নিষ্ফল[২০] সেই সূতপুত্র কর্ণও আমি নই। দ্রোণপুত্র আমি আজ একাকী উদ্যত অস্ত্র হাতে নিয়ে (যথার্থ) বলীর মুখোমুখি হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। ॥৫৭॥

আমার রণকৌশলের গৌরব করেই-বা কী হবে? জুটলই-বা তাতে প্রশংসা, কিন্তু বিজয়ান্তে তো তা ফলপ্রসূ হল না। (পরিক্রমা করে) না, না, ব্যাপারটা এরকম নয়। আমি যখন প্রয়াত পিতৃদেবের উদ্দেশে তিল-জলাঞ্জলি দানে ব্যাপৃত ছিলাম, সম্ভবত তখনই কুরুকুলতিলক

মহারাজ দুর্যোধন প্রতারিত হয়েছেন। (তবুও) কে বিশ্বাস করবে সে কথা? কেননা—

রথে কিংবা গজে আরূঢ়, হস্তে ধনুর্ধারী, একাদশ অক্ষৌহিণীর নায়ক রাজারা কৃতাঞ্জলি হয়ে যাঁর আজ্ঞা লাভের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকত; পরশুরামের শরচুম্বিত কবচধারী ভীষ্ম এবং আমার বীর পিতৃদেব যার পক্ষে ছিলেন, সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা দুর্যোধন প্রতিকূল কালের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ॥৫৮॥

আচ্ছা গান্ধারীপুত্র (এখন) গেলেনই-বা কোথায়?

(পরিক্রমা করে এবং দেখে)

এই তো সমর-সাগর-পারঙ্গম কুরুরাজ নিহত গজ-অশ্ব-পদাতিক এবং ভগ্নরথের প্রাচীরের মধ্যে অবস্থান করছেন। এই তো তিনি যাঁর—

শিরস্ত্রাণ পড়ে যাওয়ায় যাঁর আলুলায়িত কেশরাজি রবিরশ্মিজালের মতো প্রতীত হচ্ছে, গদাঘাতজনিত ক্ষতস্থানের শোণিতে সিক্ত যাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; অস্তাচল-শীর্ষ-শিলা-সমাসীন সন্ধ্যামগ্ন দিনান্তের সূর্যের মতো তিনি এখন অস্তগামী। ॥৫৯॥

(এগিয়ে গিয়ে) এই যে কুরুরাজ, এ কী?

দুর্যোধন— গুরুপুত্র, এ হল অসন্তোষের ফল।

অশ্বত্থামা— ওহে কুরুরাজ! সম্মানের উৎসমূলটাকেই ফিরিয়ে এনে দেব।

দুর্যোধন— আপনি কী করবেন?

অশ্বত্থামা— শুনুন—

শস্ত্রসমূহের সাহায্যে আমি পাণ্ডুতনয়দের সঙ্গে একত্র যুদ্ধোদ্দত গরুড়পৃষ্ঠে সমারূঢ় ভয়ঙ্কর-চতুর্ভুজবিশিষ্ট উদ্যত-চাপ-চক্রধারী কৃষ্ণকে এলোমেলো আলেখ্যের চিত্রপটের মতো ছুড়ে ফেলব।[২১] ॥৬০॥

দুর্যোধন— না, না। আপনি এরূপ বলবেন না।

অভিষিক্ত রাজারা সকলে ধাত্রী বসুধার কোলে শায়িত, কর্ণ স্বর্গে গেছেন, শান্তনু-পুত্রের (ভীষ্মের) দেহপাত ঘটেছে, আমার শত ভ্রাতা রণাঙ্গনের পুরোভাগে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আমার নিজের এই অবস্থা। গুরুপুত্র, আপনি ধনুক ত্যাগ করুন। ॥৬১॥

অশ্বত্থামা— ওহে কুরুরাজ!

গদাপাত ও কেশ-আকর্ষণের যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র (ভীম) ঊরুদ্বয়ের সঙ্গে আপনার দর্পকেও কি আজ চূর্ণ করেছে? ॥৬২॥

দুর্যোধন— না, না। এরূপ বলবেন না। রাজারা মূর্তিমান্ আত্মসম্মান। সম্মানের স্বার্থেই আমি যুদ্ধ বরণ করেছি। ভেবে দেখুন, গুরুপুত্র।

হস্তমুষ্টিতে কেশাকর্ষণ করে দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় কীভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল? কতটুকু বা ছেলে অভিমন্যু,— তাকেও যুদ্ধে কীভাবে হত্যা করা হল? আর, পাশা খেলার ছলে পরাজিত পাণ্ডবদের কীভাবে বনে বন্যপশুদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়েছিল? ভেবে দেখুন তবে, যুদ্ধযজ্ঞেও দীক্ষিত তারা আমার দর্প-চূর্ণ করতে সেই তুলনায় কত কম লাঞ্ছনা করেছে।[২২] ॥৬৩॥

অশ্বত্থামা— সব দিক ভেবে-চিন্তে প্রতিজ্ঞা করেছি। আপনার, নিজের এবং সমস্ত বীরের নামে আমি শপথ করছি : নৈশযুদ্ধ শুরু করে সেই যুদ্ধে আমি পাণ্ডবদের দগ্ধ করব। ॥৬৪॥

বলদেব— গুরুপুত্র যেমনটি বললেন, সেরকমই ঘটবে।

অশ্বত্থামা— এই যে ভগবান্ হলায়ুধ, আপনি!

ধৃতরাষ্ট্র— হায়! বঞ্চনার সাক্ষী তবে রয়ে গেছেন!

অশ্বত্থামা— দুর্জয়, এদিকে এস।

পিতার পরাক্রমে পৈতৃক অধিকারের যোগ্য তথা পিতার বাহুবলে প্রাপ্ত রাজ্যে অভিষেক বিনাই ব্রাহ্মণোক্ত বচনানুসারে তুমি রাজা হও ॥৬৫॥

দুর্যোধন— অহো! আমার মনঃপুত কাজ করা হয়েছে। প্রাণ বুঝি আমার চলে যায়। এই তো এখানে শান্তনু প্রমুখ আমার পূজ্য পিতৃপিতামহগণ। এই যে কর্ণকে সম্মুখে রেখে আমার শত ভ্রাতা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই তো অভিমন্যু, দু-কানের নিচ বরাবর অল্প ঝোলা চুল[২৩]— ঐরাবতের মাথার কাছে বসে মহেন্দ্রের হাত ধরে আমাকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কী যেন বলছে। উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ আমাকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসছে। এই যে সব মূর্তিমান্ মহাসাগর! এই যে গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী! এই যে আমাকে নেবার জন্য ধর্মরাজ সহস্র-মরালবাহিত বীরবাহী এই বিমান পাঠিয়েছেন। এই আমি আসছি।[২৪] (স্বর্গত হলেন)

ধৃতরাষ্ট্র— এবার আমি সজ্জনের কাছে সম্পদস্বরূপে বরণীয় তপোবনে চলে যাব। পুত্রনাশহেতু নিষ্ফল রাজ্যে ধিক্।

অশ্বত্থামা— আমি আজ রাত্রে সৌপ্তিকবধের[২৫] উদ্দেশ্যে তীর-ধনু হাতে চললাম।

[— ভরতবাক্য—]

বলদেব— শত্রুপক্ষকে দমন করে আমাদের নরপতি পৃথিবী পালন করুন। ॥৬৬॥

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

যবনিকা

প্রসঙ্গ কথা

১. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ধ্যানের মধ্যে প্রায় এরকমই একটি শ্লোক পাওয়া যায় :

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে ॥

ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধনদীর দুটি তীর, জয়দ্রথ যার জল, গান্ধারীতনয়েরা যাতে নীলোৎপল, শল্য যাতে কুমির, কৃপাচার্য যাতে বহতা ধারা, কর্ণ যার বেলাভূমি, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাতে ভয়ঙ্কর মকর, দুর্যোধন যার আবর্ত, কেশব কাণ্ডারী হওয়ায় নিঃসংশয়ে পাণ্ডবেরা সেই রণনদী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

২. সম্পূর্ণ লৌহাবয়ব ৪টি বা ৫টি পক্ষযুক্ত বাণকে 'নারাচ' বলে। নারাচ অতি ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণ, এর অগ্রভাগ স্বর্ণ বা রৌপ্য-চিহ্নিত এবং এর পুঙ্খ স্বর্ণনির্মিত

"সর্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈর্যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ ॥"

— *বৃহৎ শার্ঙ্গধর*।

"সুস্নিগ্ধং কোমলং লৌহমভগ্নং সুদৃঢ়ঞ্চ যৎ।
দ্বি দ্বি হস্তাশ্চ নারাচাঃ কর্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ ॥"

— *ধনুর্বেদ* (কোন্দলমণ্ডলম্)

তোমর— বঁড়শি-সংযুক্ত এক প্রকারের লৌহনির্মিত বল্লম. কারও মতে এর বাঁট কাষ্ঠ-নির্মিত হত। তোমরকে সময়ে সময়ে বিষাক্ত করা হত, তখন একে বলা হত 'বিষতোমর' কেউ কেউ একে একপ্রকারের তীক্ষ্ণ বাণ বলে বর্ণনা করেছেন। নীলকণ্ঠের মতে তোমর হচ্ছে— হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘদণ্ড অস্ত্রবিশেষ 'তোমরাশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ'— *মহাভারত*।

৩. সমন্তপঞ্চক— কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চহ্রদযুক্ত স্থান।

৪. পশ্চিম= অন্তিম বা শেষ। লক্ষণীয়— 'অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপঙ্গজস্পর্শঃ।' — *উত্তররামচরিত*— ১ম অঙ্ক।

নভঃসংক্রম— সংক্রম :— সংক্রমতি অনেন ইতি-সোপান বা সেতু। 'নভঃ' শব্দের দ্বারা নভঃস্থ বা আকাশস্থ সূর্য লক্ষিত হয়েছে। যুদ্ধাশ্রম রাজাদের পক্ষে সূর্যলোকপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ। মনু বলেছেন :

"আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৭/৮৯

মহাভারতে বলা হয়েছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥

৫. কার্মুক— ধনুঃ। সচরাচর 'কৃমুক' কাষ্ঠে নির্মিত হত বলে ধনুক অর্থে কার্মুক শব্দের প্রচলন ঘটে।

৬. লোকজীবনের সঙ্গে পরিচিত একটি সুন্দর চিত্রকল্প শ্লোকটিতে ফুটে উঠেছে। নবীন জামাতাকে বন্ধুস্থানীয়া কুটুম্বিনীরা স্বাগত জানাতে এগিয়ে এসে পালকি থেকে যেমন টেনে নামায়, উৎফুল্ল শৃগালীরা তেমনি রথ থেকে রথীকে টেনে নামাচ্ছে। বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের ব্যাপারটিকে এমন সুন্দর ভাষায় বলায় সেটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে Euphemism বা মঞ্জুভাষণের এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

৭. কুন্ত— এক প্রকার বর্শা। এই অস্ত্র লৌহময়, অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ছয় পল, পাঁচ হাত লম্বা, পাদদেশ গোল, দেখতে ভীষণ। কুন্তে লৌহের প্রধান ফাল ব্যতীত অপর একটি ফাল সংলগ্ন থাকত এবং এর দ্বারা অব্যর্থ শূলকে নিবারণ করা হত। "দশহস্তমিতঃ কুন্তঃ ফালাগ্রঃ শঙ্কুবুধ্নকঃ"— *শুক্রনীতিসার* ৪. ৭. ২১৫।

কবচ— ক (বায়ু)— বঞ্চ্ + অ। যার দ্বারা শরীর আবৃত করলে বায়ু পর্যন্ত বঞ্চিত হয় অর্থাৎ গাত্র স্পর্শ করতে পারে না, সাঁজোয়া

শক্তি— লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণধার ক্ষেপণীয় অমোঘ যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ! প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ধানুকীই শক্তির ব্যবহার করতেন শক্তি একবারে মাত্র একটি লোককে হত্যা করতে পারত। দুই হাতে তুলে ক্ষেপণ করতে হয় এই অস্ত্রকে। এটি অন্যূন দু-হাত লম্বা, সিংহমুখাকৃতি, মুঠো করে ধরবার জন্য বড় হাতল বিশিষ্ট এবং ঘণ্টাযুক্ত; তীক্ষ্ণ নখর এবং জিহ্বাবিশিষ্ট এই ভীষণ অস্ত্র তির্যক্‌গতিতে বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারত।

প্রাস— ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। উইলসন একে কুন্তের সঙ্গে অভিন্ন বলে নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য শ্লোকে— কুন্তের উল্লেখ পৃথকভাবেই রয়েছে বলে মনে হয়— 'প্রাস' সম্ভবত ছোট বর্শাকে বোঝাচ্ছে। "প্রাসের আকৃতি— সাত হাত লম্বা বংশাদি দণ্ড, তার মস্তকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা, মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা, ফলকের নিচে ও মূলে রেশমস্তবকে সুশোভিত, ইহার চারি প্রকার ব্যবহারের নিয়ম— আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন অর্থাৎ ইতস্তত পরিচালন ও পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ।"— 'প্রাসাস্ত্রন্তু চতুর্হস্তং দণ্ডবুধ্নং ক্ষুরাননম্।'

পরশু— কুঠার বা টাঙ্গি তুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

ভিণ্ডিপাল— ভিন্দিপাল— হস্তক্ষেপ্য লগুড়। *অমরকোষ-টীকায়* একে বলা হয়েছে নালিকাস্ত্র। 'ভিন্দিপালস্তু বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ : হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তঃ করসম্মিতমণ্ডলঃ॥'— *বৈশম্পায়ন-সংহিতা*।

শূল-সূক্ষ্মাগ্র লৌহাস্ত্র; শিবের ত্রিশূলের অনুকরণে নির্মিত ত্রিফলকবিশিষ্ট লৌহশূল। 'ত্রিশিখং শূলম্'— *শ্রীমদ্ভাগবত*— ৩. ১৯. ১২।

মুসল— সর্বাঙ্গ সমান দণ্ডাকৃতি যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

মুদ্গর— মুগুর।

বরাহকর্ণ— একপ্রকার অস্ত্র। শূকরকর্ণাকৃতি একপ্রকার বাণ বলে উইলসন মনে করেন।

কণপ— আগ্নেয়যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'লৌহস্তম্ভস্তু কণপঃ'— *বৈজয়ন্তী*।

কর্পণ— একজাতীয় বর্শা। "চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাস-পট্টিশ"— *দশকুমারচরিত*।

শঙ্কু— সূক্ষ্মাগ্রযুক্ত শল্যাস্ত্র। সড়কি। 'নিক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ'॥ *মনুসংহিতা*— ৮/২৭১

ত্রাসিগদা— ত্রাসজনক গদা; 'frightful mace'— G. K. Bhat. গদা সচরাচর লৌহনির্মিত এবং মোচার ন্যায় অগ্রভাগ ক্রমশ সূক্ষ্মাকৃতি। এই গদার উপরে লৌহশলাকা প্রোথিত থাকত এবং নানারূপ ধাতুনির্মিত অলঙ্কারে গদাকে সজ্জিত করা হত। যে সমস্ত গদা শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হত, তারা দৈর্ঘ্যে প্রায় চার বিঘত হত। ষট্‌কোণ এবং অষ্টকোণ গদাকে যমের দণ্ড অথবা ইন্দ্রের অশনির সঙ্গে তুলনা করা হত।

৮. অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি ব্যাধির উপশম করতে অর্জুন খাণ্ডববন দহনে তাঁকে সাহায্য করেন। *মহাভারতের* আদিপর্বে খাণ্ডবদাহপর্ব্যাধ্যায়ে এ বৃত্তান্ত বর্ণিত রয়েছে।—

ইন্দ্রলোকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে দেবরাজ একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, "আমার শত্রু নিবাতকবচ নামে তিনকোটি দানব সমুদ্রমধ্যস্থিত দুর্গে বাস করে; যেমনি তাদের রূপ, তেমনি তাদের বীর্য ও তেজ এদের বধ করে তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" ইন্দ্রের এই আদেশ শিরোধার্য করে অর্জুন নিবাতকবচদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দানবনগরে গেলেন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত নিবাতকবচদের নিঃশেষে নিহত করলেন। — *মহাভারত*, বনপর্ব।

আলোচ্য শ্লোকটিতে একটি হৃদ্য ব্যতিরেকধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। যে পরাক্রমী রাজাদের মৃত্যু কিছুই করতে পারত না, অর্জুন তাঁদের মৃত্যুর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন— এখানেই মৃত্যুর অপেক্ষাও অর্জুনের বলবত্তার আধিক্য সূচিত।

৯. চারী— চার (পদসঞ্চরণ)+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)— নৃত্যের অঙ্গবিশেষ। এখানে নৃত্যের বিশেষ ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারকে বোঝাতেই 'চারী গতি' কথায় প্রয়োগ হয়েছে।

শ্লোকের চতুর্থ পাদের প্রসঙ্গে *মহাভারত* থেকে কিছুটা উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্বদ জনার্দন ॥"
— অর্জুনের এই জিজ্ঞাসার জবাবে বাসুদেব বললেন :
"উপদেশোহনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥
ভীমসেনস্তু ধর্মেণ যুধ্যামানো ন জেষ্যতি।
অন্যায়ের তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥"

— শল্যপর্ব— ৫৮/২-৪

১০. যুদ্ধে কাকে কাকে হত্যা করা উচিত নয়, সে সম্পর্কে মনুর নির্দেশ হল :

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্ ॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥
নাযুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্ ॥

— *মনুসংহিতা*— ৭/৯১-৯৩

১১. 'মালাসংবৃতলোচনেন' পদটিতে 'মালা'র স্থানে 'হেলা' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। এখানে 'হেলা' ধরেই অনুবাদ করা হয়েছে। 'মালা' শব্দটি স্বীকার করলে, বলদেবের পুষ্পানুরক্তির দিকটাই প্রকট হয়, কিন্তু তাঁর প্রতি হেলা বা অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়াতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয় না।

১২. প্রতিপক্ষের নাভির নিম্নদেশে গদাঘাত সামরিক রীতিনীতি অনুসারে গর্হিত কাজ, কিন্তু ভীম সেটাই তো করেছেন এবং তাঁর এ কাজে কৃষ্ণপ্রমুখের প্ররোচনাও ছিল। কিন্তু ঠিক উরুদ্বয়েই যে দুর্যোধনের প্রাণঘাতী আঘাত নেমে আসবে, এ ব্যাপারে *মহাভারত*-সূত্রে আমরা দুটি পূর্বাভাস পাই। একটি হল— কৌরবসভাতলে দ্রৌপদীকে নির্যাতিত করা হলে ভীম তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন। অপরটি হল, মহর্ষি মৈত্রেয় পূর্বে দুর্যোধনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, ভীম গদাঘাতে তাঁর উরুভঙ্গ করবেন।

সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্ক্তাস্ম্যূরূ মহাহবে।
ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥
মৈত্রেয়েণাভিপ্তশ্চ পূর্বমেব মহর্ষিণা।
উরূ তে ভেৎস্যতে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ ॥

— *মহাভারত*, শল্যপর্ব, ৬০/১৭-১৮

দুর্যোধনের উরুদেশই যে ভীমের মারাত্মক আঘাতের লক্ষ্যস্থল কেন হল— সে বিষয়ে অতিপ্রচলিত কাহিনীটিও কম আকস্মিক নয় :

গান্ধারী একবার দুর্যোধনকে সম্পূর্ণ নগ্নগাত্রে দেখতে চাইলেন, অভিপ্রায় এই যে, বারেকের জন্য নেত্রবন্ধনী মোচন করে পুত্রের সর্ব অঙ্গে দৃষ্টিজ্যোতি বিলিয়ে দেবেন এবং ফলত বজ্রায়িত হবে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। লজ্জাসংকোচ সত্ত্বেও দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত নগ্নদেহে চললেন মায়ের কাছে। পথে ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণের ছলনাময় পরামর্শে জঙ্ঘাদেশ আবৃত করে গান্ধারীর কাছে গেলেন। অনাবৃত নেত্রে গান্ধারী যেখানেই দৃষ্টি ফেললেন, সেই অঙ্গই বজ্রবৎ অভেদ্য হল, কিন্তু আবৃত জঙ্ঘায় তাঁর দৃষ্টি প্রতিহত হল। অতএব... । কৃষ্ণ জানতেন এ ঘটনা, তাই যথাকালে ভীমকে তিনি দুর্যোধনের দুর্বল স্থানেই আঘাত করতে ইঙ্গিত করেছেন।

১৩. শাল্বরাজপুরীর নাম ছিল সৌভ। রুক্মিণীর স্বয়ংবরে বৃষ্ণিদের কাছে শাল্ব পরাভূত হন। এক বৎসর দুশ্চর তপস্যার ফলে মহাদেবের কাছ থেকে তিনি এক দুর্ভেদ্য বিমান লাভ করেন। তার সাহায্যে তিনি দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। কিন্তু বলরাম তাঁকে হত্যা করেন এবং বিমানটিকেও বিধ্বস্ত করেন। বলরামের এই কৃতিত্বের বিবৃতি রয়েছে *ভাগবতপুরাণের* দশক স্কন্ধে। মহাসুর শাল্বের রাজপুরীর প্রাকারও বলরাম তাঁর হলায়ুধে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন।

কালিন্দীজলদেশিক— বলরাম একবার যমুনার জলে স্নানার্থী হয়ে যমুনাকে তাঁর কাছে সরে আসতে বললেন। কিন্তু যমুনা তাঁর কথা শুনল না দেখে তিনি যমুনার জলপ্রবাহকে বলপ্রয়োগে তাঁর অনুকূলে টেনে আনলেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই কৃতিত্বের উল্লেখই এখানে করা হয়েছে।

১৪. শ্লোকটির প্রথম তিনটি পাদে ভীমের তিনটি বড় কৃতিত্বের উল্লেখ রয়েছে :

(১) জতুগৃহ থেকে দ্রুত নিজ কাঁধে করে পাণ্ডবদের অবধারিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার;

(২) দ্রৌপদীর জন্য সৌগন্ধিক পুষ্প আহরণ করতে গন্ধমাদন পর্বতে গেলে সেখানে কুবেরানুগত গন্ধর্বদের সঙ্গে ভীমের ভীষণ লড়াই হয়। এই বৃত্তান্তের আশ্রয়েই রচিত হয় একাঙ্ক 'সৌগন্ধিকাহরণ' নাটক।

(৩) হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করে ভীম তার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন এবং ওই রাক্ষসীর গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

১৫. সুতশতপ্রবিভক্তচক্ষুঃ— ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে প্রযুক্ত এই বিশেষণটিতে ভাস তাঁর কল্পনার কোমল সুষমা কী-সুন্দর সংবেদনশীলতার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন। শত পুত্রে বণ্টিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টি, তাই তো তিনি দৃষ্টিহীন। কিন্তু খেদ কী তাতে? শত পুত্রের শত জোড়া চোখের দৃষ্টিতেই তিনি চক্ষুষ্মান্। মনে পড়ে, ভারবি রাজাদের বলেছেন 'চারচক্ষুষঃ'। তুলনীয়— "চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ।" ধৃতরাষ্ট্রকে নিরুদ্ধদৃষ্টি করে সৃষ্টি করার অনুরূপ একটি বক্তব্য 'দূতঘটোৎকচে'ও পাই :

মনো সুরৈস্ত্রিদিবরক্ষণজাতশঙ্কৈস্ত্রাসান্নিমীলিতমুখোহত্রভবান্
হি সৃষ্টঃ ॥ ১/৩৫

১৬. তুলনীয় : 'বিসৃজতি হিম-গর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈঃ— *শাকুন্তল* ৩/৩

১৭. *মহাভারতে* ভগ্নোরু দুর্যোধন সঞ্জয়ের মাধ্যমে জনক-জননীর উদ্দেশে বলেছিলেন :

তৌ হি সঞ্জয় দুঃখার্তৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাদ্ধি মে।
ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সমগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥
মূর্ধ্নিস্থিতমমিত্রাণাং জীবতামে সঞ্জয়।
দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাং চ প্রিয়ং কৃতম্।

— শল্যপর্ব, ৬৪/১৮-১৯

১৮. পৌরবীর সহমরণের সংকল্প-ঘোষণায় দুর্যোধনের নীরবতা সহমরণের প্রতি স্বীকৃতির কথাই বোঝায় না কি?

১৯. অধ্বর্যু-বৈদিক যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্। ইনি যজুর্বেদের পুরোহিত। যজ্ঞকর্মে যজুর্বেদেরই প্রাধান্য। 'যজ্ঞার্হত্বাদ্ যজুর্বেদস্যৈব প্রাদান্যম্।' অধ্বর্যু আহূত দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দেন। নিরুক্তকার যাস্কের মতে ইনি অধ্বর বা যজ্ঞকে যোজিত করেন ('অধ্বরং যুনক্তি')— তাই অধ্বরযু বা অধ্বর্যু। ইনিই যজ্ঞের নেতা— 'অধ্বরস্য নেতা'।

২০. 'শিথিলবিফলশস্ত্রঃ— ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে কর্ণ পরশুরামের কাছে গিয়েছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় উন্নততর শিক্ষা নিতে। কেবল ব্রাহ্মণশিষ্যকেই পরশুরাম অস্ত্রশিক্ষা দেবেন— তাঁর এই প্রতিজ্ঞার জন্যই কর্ণকে ওইরূপ করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে একসময় প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নন। গুরু তাঁকে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ দেন যে— কার্যকালে কর্ণের অস্ত্র বিফল হবে। 'কর্ণভার-নাটকে' কর্ণ এই অভিশাপের কথা নিজেই বলেছেন— 'বুদ্ধবা মাং চ শশাপ কালবিফলান্যস্ত্রাণি তে সন্ত্বিতি॥'— শ্লোক— ১০॥

২১. 'সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটম্'— চিত্রকল্পটি ভাসের বেশ প্রিয় বলে প্রতীত হচ্ছে। তৃতীয় শ্লোকেও আমরা এই কথাগুলোই পেয়েছি অর্থাৎ একই গ্রন্থে দুবার।

২২. মৃত্যু যখন তাঁর অন্তরাত্মার বাতায়নপথে উঁকি দিচ্ছে বারবার, তখন সহসা অভিনব জীবন-বীক্ষায় দীক্ষা হচ্ছে দুর্যোধনের। এই মুহূর্তে সদ্যঃ জাগরূক বিবেকের দংশনে অনুতাপের অনলে স্বর্ণশুদ্ধ হচ্ছে তাঁর অন্তর! দুর্যোধনের এই অভিনন্দনার্হ মানস বিবর্তনের সংবেদন-সুন্দর মুহূর্তটিতে আমাদের মনে পড়ছে ঈশোপনিষদের উপান্তিম একটি প্রার্থনা : "ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর"॥১৭॥

২৩. কাকপক্ষধরঃ— কাকপক্ষ বলতে কাকের পক্ষের মতো উভয়ত্র গণ্ডদেশে লম্বমান নাতিদীর্ঘ স্বল্প কেশগুচ্ছকে বোঝায়, যাকে কানপাটা বা জুলফিও বলা হয়। কাকপক্ষধর = জুলফিধারী।

২৪. অতি-আসন্ন মৃত্যুর মুখে আচ্ছন্ন চেতনায় দুর্যোধনের এই স্বপ্নদর্শন ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এ সৃষ্টি নিঃসন্দেহে পাঠক তথা দর্শকের বিস্ময় এবং সংবেদনশীলতার দাবি রাখে। মূলে অর্থাৎ *মহাভারতে* দুর্যোধন তাঁর বীরজনোচিত মৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ না করে অন্যায় যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী কৃষ্ণ তথা পাণ্ডবদেরকে যখন ভর্ৎসনায় ও ধিক্কারে জর্জর করছিলেন, তখন দুর্যোধনের প্রতি সম্বর্ধনাস্বরূপ যা ঘটেছিল, তার বিবৃতি এভাবে দেওয়া হচ্ছে :

অপতৎ সুমহদ্বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
অবাদয়ন্ত গন্ধর্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ॥
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃ সংবদ্ধমেব চ।
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ॥
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্বা নভো বৈদূর্যসন্নিভম্ ॥
অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ
দুর্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥

— শল্যপর্ব, ৬১/৫৫-৫৮

দুর্যোধনের স্বপ্নসংলাপের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো স্মরণীয় : "তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে যাও,...যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও ...সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও!"

'যবনিকান্তরণং করোতি'—

— সম্ভবত কেউ একজন যোগ্য আস্তরণে অর্থাৎ আচ্ছাদক বস্ত্রে (সেটা পর্দাও হতে পারে) দুর্যোধনের দেহটা ঢেকে দিল এটাই G. K. Bhat-এর মত। অন্যথায়— 'যবনিকাপাত' ধরলে পরের অংশটিকে দৃশ্যান্তর ধরে নিতে হয়।

২৫. সৌপ্তিকবধ— সুপ্তিকালে (রাত্রৌ) কৃতঃ = সৌপ্তিকঃ (সুপ্তি + ঠঞ্,— কালাট্‌ঠঞ্)। অথবা, সুপ্ত এব সৌপ্তিকঃ— এমনভাবেও অর্থ করা যায়। অতএব—

(১) সৌপ্তিকঃ বধঃ থেকে সৌপ্তিকবধঃ

সৌপ্তিকানাং বধঃ থেকে সৌপ্তিকবধঃ।

'সৌপ্তিকবধ' বলতে এখানে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা বোঝাচ্ছে।

ঊরুভঙ্গম্

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।)

সূত্রধারঃ—

ভীষ্মদ্রোণতটাং জয়দ্রথজলাং গান্ধাররাজহ্রদাং
কর্ণদ্রৌণিকৃপোর্মিনক্রমকরাং দুর্যোধনস্রোতসং।
তীর্ণঃ শত্রুনদীং শরাসিসিকতাং যেন প্লবেনার্জুনঃ
শত্রূণাং তরণেষু বঃ স ভগবানস্তু প্লবঃ কেশবঃ ॥১॥

এবমার্যমিশ্রান্বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে, কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে! অঙ্গ! পশ্যামি।

(নেপথ্যে)

এতে স্মো ভোঃ! এতে স্মঃ।

সূত্রধারঃ— ভবতু, বিজ্ঞাতম্

(প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ— ভাব কুতো নু খল্বতে

স্বর্গার্থমাহবমুখোদ্যতেগাত্রহোমা
নারাচতোমরশতৈর্বিষমীকৃতাঙ্গাঃ।
মত্তদ্বিপেন্দ্রদশনোল্লিখিতৈঃ শরীরৈ-
রন্যোন্যবীর্যনিকষাঃ পুরুষা ভ্রমন্তি ॥২॥

সূত্রধারঃ— মার্ষ! কিং নাবগচ্ছসি। তনয়শতনয়নশূন্যে দুর্যোধনাবশেষে ধৃতরাষ্ট্রপক্ষে, পাণ্ডবজনার্দনাবশেষে যুধিষ্ঠিরপক্ষে, রাজ্ঞাং শরীরসমাকীর্ণে সমন্ততপঞ্চকে,

এতদ্রণং হতগজাশ্বনরেন্দ্রযৌধং
সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটং প্রবিদ্ধম্।
যুদ্ধে বৃকোদরসুযোধনয়োঃ প্রবৃত্তে
যৌধা নরেন্দ্রনিধনৈকগৃহং প্রবিষ্টাঃ ॥৩॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি ভটাস্ত্রয়ঃ)

সর্বে— এতে স্মো ভোঃ! এত স্মঃ

প্রথমঃ—

বৈরস্যায়তনং বলস্য নিকষং মানপ্রতিষ্ঠাগৃহং
যুদ্ধেষ্বপ্সরসাং স্বয়ংবরসভাং শৌর্যেপ্রতিষ্ঠাং নৃণাম্
রাজ্ঞাং পশ্চিমকালবীরশয়নং প্রাণাগ্নিহোমক্রতুং
সংপ্রাপ্তা রণসংজ্ঞমাশ্রমপদং রাজ্ঞাং নভঃ সংক্রমম্ ॥৪॥

দ্বিতীয়ঃ— সম্যগ্‌ভবানাহ।

উপলবিষমা নগেন্দ্রাণাং শরীরধরাধরা
দিশি দিশি কৃতা গুধ্রাবাসা হতাতিরথা রথাঃ।
অবনিপতয়ঃ সর্গং প্রাপ্তাঃ ক্রিয়ামরণে রণে
প্রতিমুখমিমে তত্ত্বৎকৃত্বা চিরং নিহতাহতাঃ ॥৫॥

তৃতীয়ঃ— এবমেতত্।

করিবরকরযূপো বাণবিন্যস্তদর্ভো
হতগজচয়নোচ্চো বৈরবহ্নিপ্রদীপঃ।
ধ্বজবিতবিতানঃ সিংহনাদোচ্চমন্ত্রঃ
পতিতপশুমনুষ্যঃ সংস্মিতো যুদ্ধযজ্ঞঃ ॥৬॥

প্রথমঃ— ইদমপরং পশোতাং ভবন্তৌ।

এতে পরস্পরশরৈর্হৃতজীবিতানাং
দেহৈ রণজিরমহীং সমুপাশ্রিতানাম্।
কুর্বন্তি চাত্র পিশিতার্দ্রমুখা বিহঙ্গা
রাজ্ঞাং শরীরশিথিলানি বিভূষণানি ॥৭॥

দ্বিতীয়ঃ—

প্রসক্তনারাচনিপাতপতিতঃ সমগ্রযুদ্ধোদ্যতকল্পিতো গজঃ
বিশীর্ণবর্মা সশরঃ সকার্মুকো নৃপায়ুধাগারমিবাবসীদতি ॥ ৮॥

তৃতীয়— ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ।

মাল্যৈর্ধ্বজাগ্রপতিতৈঃ কৃতমুণ্ডমালং
লগ্নৈকসায়কবরং রথিনং বিপন্নম্।
জামাতরং প্রবহণাদিব বন্ধুনার্যো
হৃষ্টাঃ শিবা রথমুখাদবতারয়ন্তি ॥৯॥

সর্বে—

অহো তু খলু নিহতপতিতগজতুরগনররুধিরকলিলভূমিপ্রদেশস্য
বিক্ষিপ্তবর্মচর্মাতপত্রচামরতোমরশরকৃন্তকবচবন্ধাদিপর্যাকুলস্য
শক্তিপ্রাসপরশুভিণ্ডিপালশূলমুসলমুদ্গারবরাহকর্ণকণপকর্পণশঙ্কু-
ত্রাসিগদাদিভিবায়ুর্ধৈরবকীর্ণস্য সমন্তপঞ্চকস্য প্রতিভয়তা।

প্রথমঃ— ইহ হি,

রুধিরসরিতো নিস্তীর্যন্তে হতদ্বিপসংক্রমা
নৃপতিরহিতৈঃ স্রস্তৈঃ সুতৈর্বহন্তি রথান্ হয়াঃ।
পতিতশিরসঃ পূর্বাভ্যাসাদ্ দ্রবন্তি কবন্ধকাঃ
পুরুষরহিতা সত্তা নাগা ভ্রমন্তি যতস্ততঃ ॥১০॥

দ্বিতীয়ঃ— ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ। এতে,

গৃধ্রা মধুকমুকুলোন্নতপিঙ্গলাক্ষা
দৈত্যেন্দ্রকুঞ্জরনতাঙ্কুশতীক্ষ্ণতুণ্ডাঃ।
ভান্ত্যম্বরে বিততলম্ববিকীর্ণপক্ষা
মাংসৈঃ প্রবালরচিতা ইব তালবৃন্তাঃ ॥১১॥

তৃতীয়ঃ—

এষা নিরস্তহয়নাগনরেন্দ্রযৌধা
ব্যক্তীকৃতা দিনকরোগ্রকরৈঃ সমন্তাত্।
নারাচকুন্তশরতোমরখঙ্গকীর্ণা
তারাগণং পতিতমুদ্বহতীব ভূমিঃ ॥১২॥

প্রথমঃ— অহো ঈদৃশ্যামপ্যবস্থায়ামবিমুক্তশোভা বিরাজন্তে ক্ষত্রিয়াঃ।
ইহ হি,

স্রস্তোদ্বর্তিতনেত্রষট্পদগণা তাম্রোষ্ঠপত্রোত্করা
ভ্রূভেদাঞ্চিতকেসরা স্বমুকুটব্যাবিদ্ধসংবর্তিকা।
বীর্যাদিত্যবিবোধিতা রণমুখে নারাচনালোন্নতা
নিষ্কম্পা স্থলে পদ্মিনীব রচিতা রাজ্ঞামভীতৈর্মুখৈঃ ॥১৩॥

দ্বিতীয়ঃ— ঈদৃশানামপি ক্ষত্রিয়াণাং মৃত্যুঃ প্রভবতীতি ন শক্যং খলু বিষমস্থৈঃ পুরুষৈরাত্মবলাধানাং কর্তুম্।

তৃতীয়ঃ— মৃত্যুরেব প্রভবতি ক্ষত্রিয়াণামিতি।

প্রথমঃ— কঃ সংশয়ঃ?

দ্বিতীয়ঃ— মা মা ভবানেবম্।

স্পৃষ্টবা খাণ্ডবধূমরঞ্জিতগুণং সংশপ্তকোৎসাদনং
সর্গাক্রন্দহরং নিবাতকবচপ্রাণোপহারং ধনুঃ।
পার্থেনাস্ত্রবলান্মহেশ্বররণক্ষেপাবশিষ্টৈঃ শরে-
র্দর্পোৎসিক্তবশা নৃপা রণমুখে মৃত্যোঃ প্রতিঙাহিতাঃ ॥১৪॥

সর্ব— অয়ে শব্দঃ।

কিং মেঘা নিনদন্তি বজ্রপতনৈশ্চূর্ণীকৃতাঃ পর্বতা
নির্ঘাতৈস্তুমুলস্বনপ্রতিভয়ৈঃ কিং দার্যতে বা মহী।
কিং মুঞ্চত্যনিলাবধূতচপলক্ষুব্ধোর্মিমালাকুলং
শব্দং মন্দরকন্দরোদরদরীঃ সংহত্য বা সাগরঃ ॥১৫॥

ভবতু, পশ্যামস্তাবত্। (সর্বে পরিক্রামন্তি)

প্রথমঃ— অয়ে এতত্খলু দ্রৌপদীকেশধর্ষণাবমর্ষিতস্য পাণ্ডবমধ্যমস্য ভীমসেনস্য ভ্রাতৃশতবধক্রুদ্ধস্য মহারাজদুর্যোধনস্য চ দ্বৈপায়নহলায়ুধকৃষ্ণ বিদুর প্রমুখানাং কুরুযদুকুলদেবতানাং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তং গদাযুদ্ধম্।

দ্বিতীয়ঃ—

ভীমস্যোরসি চারুকাঞ্চনশিলাপীনে প্রতিস্ফালিতে
ভিন্নে বাসবহস্তিহস্তকঠিনে দুর্যোধনাংসস্থলে।
অন্যোন্যস্য ভুজদ্বয়ান্তরতটেষ্বাসজ্যমানায়ুধে
যস্মিংশ্চণ্ডগদাভিঘাতজনিতঃ শব্দঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥১৬॥

তৃতীয়ঃ— এষ মহারাজঃ,

শীর্ষোত্কংপনবল্গমানমুকুটঃ কোধাগ্নিকাক্ষাননঃ
স্থানাক্রামণবামনীকৃততনুঃ প্রত্যগ্রহস্তোচ্ছ্রয়ঃ।
যস্যৈষা রিপুশোণিতার্দ্রকলিলা ভাত্যগ্রহস্তে গদা
কৈলাসস্য গিরেরিবাগ্ররচিতা সৌল্কা মহেন্দ্রাশনিঃ ॥১৭॥

প্রথমঃ— এষ সংপ্রহাররুধিরসিক্তাঙ্গস্তাবদ্দৃশ্যতাং পাণ্ডবঃ

নির্ভিন্নাগ্রললাটবান্তরুধিরো ভগ্নাং কূটদ্বয়ঃ
সান্দ্রৈর্নিগলিতপ্রহাররুধিরৈরার্দ্রীকৃতোরঃস্থলঃ
ভীমো ভাতি গদাভিঘাতরুধিরক্লিন্নাবগাড়ব্রণঃ
শৈলো মেরুরিবৈষ ধাতুসলিলাসারোপদিগ্ধোপলঃ ॥১৮॥

দ্বিতীয়ঃ—

ভীমাং গদাং ক্ষিপতি গর্জতি বল্গমানঃ
শীঘ্রং ভুজং হরতি তস্য কৃতং ভিনত্তি
চারীং গতিং প্রচরতি প্রহরত্যভীক্ষ্ণং
শিক্ষান্বিতো নরপতির্বলবাংস্তু ভীমঃ ॥১৯॥

তৃতীয়ঃ— এষ বৃকোদরঃ,

শিরসি গুরুনিখাতস্রস্তরক্তার্দ্রগাত্রো
ধরণিধরনিকাশঃ সংযুগেষ্বপ্রমেয়ঃ।
প্রবিশতি গিরিরাজো মেদিনীং বজ্রদগ্ধঃ
শিথিলবিসৃতধাতুর্হেমকূটো যথাদ্রিঃ ॥২০॥

প্রথমঃ— এষ গাঢ়প্রহারশিথিলীকৃতাঙ্গং নিপতন্তং ভীমসেনং দৃষ্ট্বা, একাগ্রাংগুলি-ধারিতোন্নতমুখো ব্যাসঃ স্থিতো বিস্মিতঃ।

দ্বিতীয়ঃ— দৈন্যং যাতি যুধিষ্ঠিরোহত্র বিদুরো বাষ্পাকুলাক্ষঃ স্থিতঃ।

তৃতীয়ঃ— স্পৃষ্টং গাণ্ডিবমর্জুনেন গগনং কৃষ্ণঃ সমুদ্বীক্ষতে।

সর্বে— শিষ্যপ্রীততয়া হলং ভ্রময়তে রামো রণপ্রেক্ষকঃ ॥২১॥

প্রথমঃ— এষ মহারাজঃ

বীর্যালয়ো বিবিধরত্নবিচিত্রমৌলি-
র্যুক্তোহভিমানবিনয়দ্যুতিসাহসৈশ্চ।
বাক্যং বদত্যুপহসন্ন তু ভীম! দীনং
বীরো নিহন্তি সমরেষু ভয়ং ত্যজেতি ॥২২॥

দ্বিতীয়ঃ— এষ সংজ্ঞয়া সমাশ্বাসিতো মারুতিঃ,

সংহৃত্য ভ্রূকুটীর্ললাটবিবরে স্বেদং করেণাক্ষিপন্
বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য ভীমবদনশ্চিত্রাঙ্গদাং স্বাং গদাম্।
পুত্রং দীনমুদীক্ষ্য সর্বগতিনা লব্ধেব দত্তং বলং
গর্জন্ সিংহবৃষেক্ষণঃ ক্ষিতিতলাদ্ ভূয়ঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥২৩॥

প্রথমঃ— হন্ত পুনঃ প্রবৃত্তং গদাযুদ্ধম্। অনেন হি,

ভূমৌ পাণিতলে নিঘৃষ্য তরসা বাহু প্রমৃজ্যাধিকং
সন্দষ্টোষ্ঠপুটেন বিক্রমবলাৎ ক্রোধাধিকং গর্জতা।
ত্যক্তা ধর্মঘৃণাং বিহায় সময়ং কৃষ্ণস্য সংজ্ঞাসমং
গান্ধারীতনয়স্য পাণ্ডুতনয়েনোর্বোর্বিমুক্তা গদা ॥২৪॥

সর্বে— হা ধিক্ পতিতো মহারাজঃ।

তৃতীয়ঃ— এষ রুধিরপতনদ্যোতিতাংঙ্গং নিপতন্তং কুরুরাজং দৃষ্ট্বা খমুৎপতিতো ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ।

য এষঃ,

মালাসংবৃতলোচনেন হলিনা নেত্রোপরোধঃ কৃতঃ
দৃষ্ট্বা ক্রোধনিমীলতং হলধরং দুর্যোধনাপেক্ষয়া।
সংভ্রান্তৈঃ করপঞ্জরান্তরগত্যে দ্বৈপায়নজ্ঞাপিতো
ভীমঃ কৃষ্ণভুজবলান্বিতগতির্নির্বাহ্যতে পাণ্ডবৈঃ ॥২৫॥

প্রথমঃ— অয়ে অয়মপ্যমর্ষোন্মীলিতরভসলোচনো ভীমসেনাপক্রমণমুদ্বীক্ষমাণঃ ইত এবাভিবর্ততে ভগবান্ হলায়ুধঃ। য এষঃ,

চলবিলুলিতমৌলিঃ ক্রোধতাম্রায়তাক্ষো
ভ্রমরমুখবিদষ্টাং কিঞ্চিদুৎকৃষ্য মালাম্।
অসিততনুবিলম্বিস্রস্তবস্ত্রানুকর্ষী
ক্ষিতিতলমবতীর্ণঃ পারিবেষীব চন্দ্রঃ ॥২৬॥

দ্বিতীয়ঃ— তদাগম্যতাং বয়মপি তাবন্মহারাজস্য প্রত্যন্তরীভবামঃ।

উভৌ— রাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি বলদেবঃ)

বলদেবঃ— ভো ভোঃ পার্থিবাঃ! ন যুক্তমিদম্।

মম রিপুবলকালং লাঙ্গলং লঙ্ঘয়িত্বা
রণকৃতমতিসন্ধিং মাং চ নাবেক্ষ্য দর্পাৎ।
রণশিরসি গদাং তাং তেন দুর্যোধনর্বোঃ
কুলবিনয়সমৃধ্যা পাতিতঃ পাতয়িত্বা ॥২৭॥

ভো দুর্যোধন! মুহূর্তং তাবদাত্মা ধার্যতাম্।

সৌভোচ্ছিষ্টমুখং মহাসুরপুরপ্রাকারকূটাঙ্কুশং
কালিন্দীজলদেশিকং রিপুবলপ্রাণোপহারার্চিতম্।
হস্তোৎক্ষিপ্তহলং করোমি রুধিরস্বেদার্দ্রপঙ্কোত্তরং
ভীমস্যোরসি যাবদদ্য বিপুলে কেদারমার্গাকুলম্ ॥২৮॥

(নেপথ্যে)

প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্ হলায়ুধঃ।

বলদেবঃ— অয়ে এবং গতোহপ্যনুগচ্ছতি মাং তপস্বী দুর্যোধনঃ। য এষঃ,

শ্রীমান্ সংযুগচন্দনেন রুধিরেণার্দ্রনুলিপ্তচ্ছবি—
র্ভূসংসর্পণরেণুপাটলভুজো বাল্ব্রতং গ্রাহিতঃ
নির্বৃত্তেহমৃতমন্ধনে ক্ষিতিধরান্মুক্তঃ সুরৈঃ সাসুরৈ—
রাকর্ষন্নিব ভোগমর্ণবজলে শ্রান্তোজ্ঝিতো বাসুকিঃ ॥২৯॥

(ততঃ প্রবিশতি ভগ্নোরুযুগলো দুর্যোধনঃ)

দুর্যোধনঃ— এষ ভোঃ!

ভীমেন ভিত্ত্বা সময়ব্যবস্থাং গদাভিঘাতক্ষজর্জরোরুঃ।
ভূমৌ ভুজাভ্যাং পরিকৃষ্যমাণং স্বং দেহমর্ধোপরতং বহামি ॥৩০॥
প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্ হলায়ুধঃ।

ত্বৎপাদয়োর্নিপতিতং পতিতস্য ভূমা—
বেতচ্ছিরঃ প্রথমমদ্য বিমুঞ্চ রোষম্।
জীবন্তু তে কুরুকুলস্য নিবাপমেঘা
বৈরং চ বিগ্রহকথাশ্চ বয়ং চ নষ্টাঃ ॥৩১॥

বলদেবঃ— ভোঃ দুর্যোধন! মুহূর্তং তাবদাত্মা ধার্যতাম্।

দুর্যোধনঃ— কি ভবান্ করিষ্যতি?

বলদেবঃ— ভো শ্রূয়তাম্।

আক্ষিপ্তলাঙ্গলমুখোল্লিখিতৈঃ শরীরৈ—
নির্দারিতাং সহৃদয়ানুসলপ্রহারৈঃ।
দাস্যামি সংযুগহতান্সরথাশ্চনাগান্
স্বর্গানুযাত্রপুরুষাংস্তব পাণ্ডুপুত্রান্ ॥৩২॥

দুর্যোধনঃ— মা মা ভবানেবম্।

প্রতিজ্ঞাবসিতে ভীমে গতে ভ্রতৃশতে দিবম্।
ময়ি চৈবং গতে রাম! বিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

বলদেবঃ— মৎপ্রত্যক্ষং বঞ্চিতো ভবানিত্যুৎপন্নো মে রোষঃ।

দুর্যোধনঃ— বঞ্চিত ইতি মাং ভবান্ মন্যতে?

বলদেবঃ— কং সংশয়ঃ।

দুর্যোধনঃ— হন্ত ভোঃ! দত্তমূল্যা ইব মে প্রাণাঃ। কুতঃ,

আদীপ্তানলদারুণাজ্জুতুগৃহাদ্বুধ্যাত্মনির্বাহিণা
যুদ্ধে বৈশ্রবণালয়েহচলশিলাবেগপ্রতিস্ফালিনা
ভীমেনাদ্য হিড়িম্বারাক্ষসপতিপ্রাণপ্রতিগ্রাহিণা
যদ্যেবং সমবৈষি মাং ছলজিতং ভো রাম! নাহং জিতঃ ॥৩৪॥

বলদেবঃ— ভীমসেন ইদানীং তব যুদ্ধবঞ্চনামুৎপাদ্য স্থাস্যতি।

দুর্যোধনঃ— কিং চাহং ভীমসেনেন বঞ্চিতঃ।

বলদেবঃ— অথ কেন ভবানেবংবিধঃ কৃতঃ?

দুর্যোধনঃ— শ্রূয়তাম্,

যেনেন্দ্রস্য স পারিজাতকতরুর্মানেন তুল্যং হৃতো
দিব্যং বর্ষসহস্রমর্ণবজলে সুপ্তশ্চ যো লীলয়া।
তীব্রাং ভীমগদাং প্রবিশ্য সহসা নির্ব্যাজযুদ্ধপ্রিয়—
স্তেনাদং জগতঃ প্রিয়েণ হরিণা মৃত্যোঃ প্রতিগ্রাহিতঃ ॥৩৫॥

(নেপথ্যে)

উস্সরহ উস্সরহ অয্যা! উস্সরহ। (উৎসরতোৎসরতার্যাঃ! উৎসরত।)

বলদেবঃ— (বিলোক্য) অয়ে অয়মত্রভবান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী চ দুর্জয়েনাদেশিতমার্গো-হন্তঃপুরানুবদ্ধ শোকাভিভূতহৃদয়শ্চকিতগতিরিত এবাভির্ততে!

য এষঃ,

বীর্যাকরঃ সুতশতপ্রবিভক্তচক্ষু—
দর্পোদ্যতঃ কনকযূপবিলম্ববাহঃ।
সৃষ্টো ধ্রুবং ত্রিদিবরক্ষণজাতশংকৈ-
র্দৈবৈররাতিতিমিরাঞ্জলিতাড়িতাক্ষঃ ॥৩৬॥

(ততঃ প্রবিশতি ধৃতরাষ্ট্রো গান্ধারী দৈব্যৌ দুর্জয়শ্চ)

ধৃতরাষ্ট্রঃ— পুত্র ক্বাসি।

গান্ধারী— পুত্তঅ! কহিং সি? (পুত্রক! ক্বাসি?)

দেব্যৌ— মহারাজ! কহিং সি? (মহারাজ! ক্বাসি?)

ধৃতরাষ্ট্রঃ— ভোঃ! কষ্টম্।

বঞ্চনানিহতং শ্রুত্বা সুতমদ্যাহবে মম।
মুখমন্তর্গতাস্রাক্ষমন্ধমন্ধতরং কৃতম্ ॥৩৭॥
গান্ধারী! কিং ধরসে?

গান্ধারী— জীবাবিদম্হি মন্দভাআ। (জীবিতাস্মি মন্দভাগা।)

দেব্যৌ— মহারাঅ! মহারাঅ! (মহারাজ। মহারাজ।)

রাজা— ভো! কষ্টম্। যন্মামপি স্ত্রিয়ো রুদন্তি।

পূর্বং ন জানামি গদাভিঘাত-
রুজামিদানীং তু সমর্থয়ামি।
যন্মে প্রকাশীকৃতমূর্ধজানি
রণং প্রবিষ্টান্যবরোধনানি ॥৩৮॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ— গান্ধারি! কিং দৃশ্যতে দুর্যোধননামধেয়ঃ কুলমানী?

গান্ধারী— মহারাঅ! ণ দিস্সদি। (মহারাজ! ন দৃশ্যতে।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ— কথং ন দৃশ্যতে? হন্ত ভো! অদ্যাস্ম্যহমন্ধো যোহহমন্বেষ্টব্যে কালে পুত্রং ন পশ্যামি। ভোঃ কৃতান্তাহতক।

রিপুসমরবিমর্দং মানবীর্যপ্রদীপ্তং
সুতশতমতিধীরং বীরমুৎপাদ্য মানম্।
ধরণিতলবিকীর্ণং কিং স যোগ্যা ন ভোক্তুং
সকৃদপি ধৃতরাষ্ট্রঃ পুত্রদত্তং নিবাপম্ ॥৩৯॥

গান্ধারী— জাদ সুযোধন! দেহি মে পড়িবঅণং। পুত্তসদাবিণাসুদুখিতং সমস্সাসেহি মহারাঅং। (জাত সুযোধন। দেহি মে প্রতিবচনম্। পুত্রশতবিনাশদুঃস্থিতং সমাশ্বাসয় মহারাজম্।)

বলদেবঃ— অয়ে! ইয়মত্রভবতী গান্ধারী।

যা পুত্র পৌত্রবদনেষ্বকুতূহলাক্ষী
দুর্যোধনাস্তমিতশোকনিপীতধৈর্যা।
অস্রৈরজস্রমধুনা পতিধর্মচিহ্ন-
মার্দ্রীকৃতং নয়নবন্ধমিদং দধাতি ॥৪০॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ— পুত্র দুর্যোধন! অষ্টাদশাকৌহিণী-মহারাজঃ! ক্বাসি?

রাজা— অদ্যাস্মি মহারাজঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ— এহি পুত্রশতজ্যেষ্ঠ! দেহি মে প্রতিবচনম্।

রাজা— দদামি খলু পতিবচনম্। অনেন বৃত্তান্তেন ব্রীলিতোহস্মি।

ধৃতরাষ্ট্রঃ— এহি পুত্র! অভিবাদয়স্ব মাম্।

রাজা— অয়ময়মাগচ্ছামি। (উত্থানং রূপয়িত্বা পততি) হা ধিক্! অয়ং মে দ্বিতীয়ঃ প্রহারঃ। কষ্টং ভোঃ।

হৃতং মে ভীমসেনেন গদাপাতকচগ্রহে।
সমমূরুদ্বয়েনাদ্য গুরোঃ পাদাভিবন্দনম্ ॥৪১॥

গান্ধারী— এথ জাদা! (অত্র জাতে!)

দেব্যৌ— অয্যে! ইমা ম্হ। (আর্যে! ইমে স্বঃ।)

গান্ধারী— অন্নেসহ ভত্তারং। (অন্বেষেথাং ভর্তারম্)।

দেব্যৌ— গচ্ছাম মন্দভাআ (গচ্ছাবঃ মন্দভাগে।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ— ক এষ ভো! মত বস্ত্রান্তমাকর্ষন্ মার্গমাদেশয়তি।

দুর্জয়ঃ— তাদ! অহং দুর্জও। (তাত! অহং দুর্জয়ঃ।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ— পৌত্র দুর্জয়! পিতরমন্বিচ্ছ।

দুর্জয়ঃ— তাদ! পরিস্সংতো খু অহং। (তাত! পরিশ্রান্তঃ খল্বহম্।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ— গচ্ছ, পিতুরঙ্গে বিশ্রমস্ব।

দুর্জয়ঃ— তাদ! অহং গচ্ছামি। (উপসৃত্য) তাদ! কহিং সি? (তাত! অহং গচ্ছামি। তাত ক্বাসি?)

রাজা— অয়মপ্যাগতঃ। ভোঃ! সর্বাবস্থায়াং হৃদয়সন্নিহিতঃ পুত্রস্নেহো মাং দহতি। কুতঃ,

দুঃখানামনভিজ্ঞো যো মমাঙ্কশয়নোচিতঃ।
নির্জিতং দুর্জয়ো দৃষ্ট্বা কিন্নু মামভিধাস্যতি ॥৪২॥

দুর্জয়ঃ— অঅং মহারাও ভূমীএ উববিট্ঠো। (অয়ং মহারাজো ভূম্যামুপবিষ্টঃ।)

রাজা— পুত্র কিমর্থমিহাগতঃ?

দুর্জয়ঃ— তুবং চিরায়সি ত্তি। [ত্বং চিরায়সীতি।]

রাজা— অহো অস্যামবস্থায়ামপি পুত্রস্নেহো হৃদয়ং দহতি।

দুর্জয়ঃ— অহং পি খু দে অঙ্কে উববিসামি। (অঙ্কমারোহতি) [অহমপি খলুতে অঙ্কে উপবিশামি।]

রাজা— (নিবার্য) দুর্জয়! দুর্জয়! ভো কষ্টম্।

হৃদয়প্রীতিজননো যো মে নেত্রোৎসবঃ স্বয়ম্।
সোহয়ং কালবিপর্যাসাচ্চন্দ্রো বহ্নিত্বমাগতঃ ॥৪৩॥

দুর্জয়ঃ— অঙ্কে উববেসং কিন্নিমিত্তং তুবং বারেসি? [অঙ্ক উপবেশং কিন্নিমিত্তং ত্বং বারয়সি?]

রাজা—

ত্যক্ত্বা পরিচিতং পুত্র! যত্র তত্র ত্বয়াস্যতাম্।
অদ্যপ্রভৃতি নাস্তীদং পূর্বভুক্তং তবাসনম্ ॥৪৪॥

দুর্জয়ঃ— কহি নু হু মহারাও গমিস্যিদি (কুত্র নু খলু মহারাজ্যে গমিষ্যতি?)

রাজা— ভ্রাতৃশতমনুগচ্ছামি।

দুর্জয়— মং পি তহি ণেহি। [মামপি তত্র নয়।]

রাজা— গচ্ছ পুত্র! এবং বৃকোদরং ব্রূহি।

দুর্জয়— এহি মহারাঅ! অণ্ণেসীঅসি। [এহি মহারাজ! অন্বিষ্যসে।]

রাজা— পুত্র কেন?

দুর্জয়— অয্যাএ অয্যেণ সব্বেণ অন্তেউরেণ অ। [আর্যযার্ষেণ সর্বেণান্তঃ পুরেণ চ।]

রাজা— গচ্ছ পুত্র! নাহমাগন্তুং সমর্থঃ।

দুর্জয়ঃ— অয়ং তুমং ণইস্সং। [অহং ত্বাং নেষ্যামি।]

রাজা— বালস্তাবদসি পুত্র।

দুর্জয়ঃ— (পরিক্রম্য) অয্যা! অঅং মহারাও। [আর্যাঃ। অয়ং মহারাজঃ।]

দেব্যৌ— হা হা! মহারাও! [হা হা মহারাজঃ।]

ধৃতরাষ্ট্রঃ— ক্বাসৌ মহারাজঃ?

গান্ধারী— কহিং মে পুত্তও? [কুত্র মে পুত্রকঃ?]

দুর্জয়ঃ— অঅং মহারাও ভূমীএ উববিট্টো। [অয়ং মহারাজো ভূম্যামুপবিষ্টঃ]

ধৃতরাষ্ট্রঃ—হন্ত ভো! কিময়ং মহারাজঃ?

যঃ কাঞ্চনস্তম্ভসমপ্রমাণো লোকে কিলৈকো বসুধাধিপেন্দ্রঃ
কৃতঃ স মে ভূমিগতস্তপস্বী দ্বারেন্দ্রকীলার্ধসমপ্রমাণঃ ॥৪৫॥

গান্ধারী— জাদ সুযোধন! পরিসসংতোসি। [জাত সুযোধন! পরিশ্রান্তোহসি।]

রাজা— ভবত্যাঃ খল্বহং পুত্রঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ— কেয়ং ভোঃ!

গান্ধারী— মহারাজ। অহমভীদপুত্তপ্পসবিণী। [মহারাজ! অহমভীতপুত্রপ্রসবিনী।]

রাজা— অদ্যোত্পন্নমিবাত্মানমবগচ্ছামি। ভোস্তত কিমিদানীং বৈক্লব্যেন?

ধৃতরাষ্ট্রঃ— পুত্র, কথমবিক্লবো ভবিষ্যামি?

যস্য বীর্যবলোৎসিক্তং সংযুগাধ্বরদীক্ষিতম্।
পূর্বং ভ্রাতৃশতং নষ্টং তৃয্যেকস্মিন্ হতে হতম্ ॥৪৬॥

(পততি)

রাজা— হা ধিক্! পতিতোহত্রভবান্। তাত! সমাশ্বাসযাত্রভবতীম্।

ধৃতরাষ্ট্রঃ— পুত্র! কিমিতি সমাশ্বাসযামি?

রাজা— অপরাঙ্মুখো যুধি হত ইতি। ভোস্তাত! শোকনিগ্রহেণ ক্রিয়তাং মমানুগ্রহঃ।

ত্বতপাদমাত্রপ্রণতাগ্রমৌলির্জ্বলন্তমপ্যগ্নিমচিন্তয়িত্বা।
যেনৈব মানেন সমং প্রসূতস্তেনৈব মানেন দিবং প্রয়ামি। ॥৪৭॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ— বৃদ্ধস্য মে জীবিততনিঃস্পৃহস্য নিসর্গসংমীলিতলোচনস্য।

ধৃতিং নিগৃহ্যাত্মনি সংপ্রবৃত্তস্তীব্রস্সমাক্রামতি পুত্রশোকঃ ॥৪৮॥

বলদেবঃ— ভোঃ! কষ্টম্।

দুর্যোধননিরাশস্য নিত্যাস্তমিতচক্ষুষঃ।
ন শক্নোম্যত্রভবতঃ কর্তুমাত্মনিবেদনম্ ॥৪৯॥

রাজা— বিজ্ঞাপযাম্যত্রভবতীম্।

গান্ধারী— ভণাহি জাদ! [ভণ জাত!]

রাজা— নমস্কৃত্য বদামি ত্বাং যদি পুণ্যং ময়া কৃতম্।

অন্যস্যামপি জাত্যাং মে ত্বমেব জননী ভব ॥৫০॥

গান্ধারী— মম মণোরহো খু তুএ ভনিদো। [মম মনোরথঃ খলু ত্বয়া ভণিতঃ।]

রাজা— মালবি! ত্বমপি শ্রুণু।

ভিন্না মে ভ্রুকুটী গদানিপতিতৈর্ব্যাযুদ্ধকালোত্থিতৈ-
র্বক্ষস্যুত্পতিতৈঃ প্রহাররুধিরৈর্হারাবকাশো হৃতঃ।
পশ্যেমৌ ব্রণকাঞ্চনাঙ্গদধরৌ পর্যাপ্তশোভৌ ভূজৌ
ভর্তা তে ন পরাঙ্মুখো যুধি হতঃ কিং ক্ষত্রিয়ে রোদিষি ॥৫১॥

দেবী— বালা এসা সহধর্মচারিণী রোদামি। [বালা এষা সহধর্মচারিণী রোদিমি।]

রাজা— পৌরবি! ত্বমপি শ্রুণু।

বেদোক্তৈর্বিবিধৈর্মখৈরভিমতৈরিষ্টং ধৃতা বান্ধবাঃ
শক্রণামুপরি স্থিতং প্রিয়শতং ন ব্যংসিতাঃ সংশ্রিতাঃ।
যুদ্ধেহষ্টাদশবাহিনীনৃপতয়ঃ সংতাপিতা নিগ্রহে
মানং মানিনি! বীক্ষ্য মে ন হি রুদন্ত্যেবংবিধানাং স্ত্রিয়ঃ ॥৫২॥

পৌরবী— এক্কাকিদপ্পবেসণিচ্চআ ণ রোদামি। [এককৃতপ্রবেশনিশ্চয়া ন রোদিমি]

রাজা— দুর্জয়! ত্বমপি শ্রুণ্য।

ধৃতরাষ্ট্রঃ— গান্ধারি! কিং নু খলু বক্ষ্যতি?

গান্ধারী— অয়ং পি তং এব্ব চিন্তেমি। [অহমপি তদেব চিন্তয়ামি।]

রাজা— অহমিব পাণ্ডবঃ শুশ্রূষয়িতব্যাঃ,

তত্রভবত্যাশ্চাং বায়াঃ কুন্ত্যা নিদেশো বর্তয়িতব্যঃ। অভিমন্যোর্জননী দ্রৌপদী চোভে মাতৃবত্পূজয়িতব্যে। পশ্য পুত্র!

শ্লাঘ্যশ্রীরভিমানদীপ্তহৃদয়ো দুর্যোধনো মে পিতা
তুল্যেনাভিমুখং রণে হত ইতি ত্বং শোকমেবং ত্যজ।
স্পৃষ্ট্বা চৈব যুধিষ্ঠিরস্য বিপুলং শৌমাপসব্যং ভুজং
দেয়ং পাণ্ডুসূতৈস্ত্বয়া মম সমং নামাবসানে জলম্ ॥৫৩॥

বলদেবঃ— অহো বৈরং পশ্চাত্তাপঃ সংবৃত্তঃ। অয়ে শব্দ ইব।

সন্নাহদুন্দুভিনিনাদবিয়োগমূকে
বিক্ষিপ্তবাণকবচব্যজনাতপত্রে।
কস্যেষ কার্মুকরবো হতসূতযোধে
বিভ্রান্তবায়সগণং গগনং করোতি ॥৫৪॥

(নেপথ্যে)

দুর্যোধনেনাততকার্মুকেণ যো যুদ্ধযজ্ঞা সহিতঃ প্রবিষ্টঃ।
তমেব ভূয়ঃ প্রবিশামি শূন্যমধ্বর্যুণা বৃভমিবাশ্বমেধম্ ॥৫৫॥

বলদেবঃ— অয়ে অয়ং গুরুপুত্রোশ্বত্থামেত এবাভিবর্ততে। য এষঃ,

স্ফুটিতকমলপত্রস্পষ্টবিস্তীর্ণদৃষ্টী
রুচিরকনকযূপব্যায়তালম্ববাহু।
সরভসমযমুগ্রং কার্মুকং কর্ষমাণঃ
সদহন ইব মেরুঃ শৃঙ্গালগ্নেন্দ্রচাপঃ ॥৫৬॥

(ততঃ প্রবিশ্যত্যশ্বত্থামা)

অশ্বত্থামা— (পূর্বোক্তমেব পঠিত্বা) ভো ভোঃ!

সমরসংরম্ভোভয়বলজলধিসঙ্গমসময়সমুত্থিতশস্ত্র-
নক্রকৃত্তবিগ্রহাঃ স্তোকাবশেষশ্বানুবদ্ধমন্দপ্রাণাঃ
সমরশ্লাঘিনো রাজানঃ! শৃন্বন্তু শৃন্বন্তু ভবন্তঃ।

ছলবলদলিতোরুঃ কৌরবেন্দ্রো ন চাহং
শিথিলবিফলশস্ত্রঃ সূতপুত্রো ন চাহম্।
ইহ তু বিজয়ভূমৌ দ্রষ্টুমদ্যোদ্যতাস্ত্রঃ
সরভসমহমেকো দ্রোণপুত্রঃ স্থিতোহস্মি ॥৫৭॥

কিমনয়া মমাপ্যপ্রতিলাভবিজয়শ্লাঘয়া সমরশ্রিয়া।

(পরিক্রম্য)

মা তাবৎ। ময়ি গুরুনিবপনব্যগ্রে বঞ্চিতঃ কিল কুরুকুলতিলকভূতঃ কুরু-রাজঃ। ক এতচ্ছ্রদ্ধাস্যতি। কুতঃ,

উদ্যত্প্রাঞ্জলয়ো রথদ্বিপগতাশ্চাপদ্বিতীয়ৈঃ করৈ-
র্যস্যৈকাদশবাহিনীনৃপতয়স্তিষ্ঠন্তি বাক্যোন্মুখাঃ।
ভীষ্মো রামশরাবলীঢ়কবচস্তাতশ্চ যোদ্ধা রণে
ব্যক্তং নির্জিত এব সোহপ্যতিরথঃ কালেন দুর্যোধনঃ ॥৫৮॥

তত্ ক্ব নু খলু গতো গান্ধারীপুত্রঃ। (পরিক্রম্যাবলোক্য)

অয়ে অয়মভিহতগজতুরগনররথপ্রাকারমধ্যগতঃ সমরপয়োধিপারগঃ কুরু রাজঃ। য এষঃ,

মৌলী নিপাতচলকেশময়ূখজালৈ-
র্গাত্রৈর্গদানিপতনক্ষতশোণিতাদ্রৈঃ।
ভাত্যস্তমস্তকশিলাতলসংনিবিষ্টঃ
সন্ধ্যাবগাঢ় ইব পশ্চিমকালসূর্যঃ ॥৫৯॥

(উপসৃত্য) ভোঃ কুরুরাজ! কিমিদম্?

রাজা— গুরুপুত্র! ফলমপরিতোষস্য।

অশ্বত্থামা— ভোঃ কুরুরাজ! সত্কারম্লমাবর্জয়িষ্যামি।

রাজা— কিং ভবান্ করিষ্যতি?

অশ্বত্থামা— শ্রূয়তাম্।

যুদ্ধোদ্যতং গরুড়পৃষ্টনিবিষ্টদেহ-
মষ্টর্বিভীমভূজমুদ্যতশার্ঙ্গচক্রম্।
কৃষ্ণং সপাণ্ডুতনয়ং যুধি শক্রজালৈঃ
সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটং ক্ষিপামি ॥৬০॥

রাজা— মা মা ভবানেবম্।

গতং ধাত্র্যত্সংগে সকলমভিষিভং নৃপকুলং
গতঃ কর্ণঃ স্বর্গং নিপতিতনুঃ শান্তনুসুতঃ।
গতং ভ্রাতৃণাং নে শতমভিমুখং সংযুগমুখে
বয়ং চৈবংভূতাঃ গুরুসুত! ধনুর্মুঞ্চতু ভবান্ ॥৬১॥

অশ্বত্থামা— ভোঃ কুরুরাজ!

সংযুগে পাণ্ডুপুত্রেণ গদাপাতকচগ্রহে।
সমমূরদ্বয়েনাদ্য দর্পোহপি ভবতো হৃতঃ ॥৬২॥

রাজা— মা মৈবম্। মানশরীরাঃ রাজানঃ। মানার্থমেব ময়া নিগ্রহো গৃহীতঃ। পশ্য গুরুপুত্র!

যত্কৃষ্টা করনিগ্রহাঞ্চিতকচা দ্যূতে তদা দ্রৌপদী
যদ্বালোহপি হতস্তদা রণমুখে পুত্রোহভিমন্যুঃ পুনঃ।
অক্ষব্যজজিতা বনং বনমৃগৈর্যত্ পাণ্ডবাঃ সংশ্রিতা
নন্বল্পং ময়ি তৈঃ কৃতং বিমৃশ ভো! দর্পাহৃতং দীক্ষিতৈঃ ॥৬৩॥

অশ্বত্থামা— সর্বথা কৃতপ্রতিজ্ঞোহস্মি।

ভবতা চাত্মনা চৈব বীরলোকৈঃ শপাম্যহম্।
নিশাসমরমুত্পাদ্য রণে ধক্ষ্যামি পাণ্ডবান্ ॥৬৪॥

বলদেবঃ— এতদ্ভবিষ্যত্যুদাহৃতং গুরুপুত্রেণ।

অশ্বত্থামা— হলায়ুধোহত্রভবান্।

ধৃতরাষ্ট্রঃ— হন্ত! সাক্ষিমতী খলু বঞ্চনা।

অশ্বত্থামা— দুর্জয়! ইতস্তাবত্।

পিতৃবিক্রমদায়াদ্যে রাজ্যে ভুজবলার্জিতে।
বিনাভিষেকং রাজা ত্বং বিপ্রোক্তৈর্বচনৈর্ভব ॥৬৫॥

রাজা— হন্ত! কৃতং মে হৃদয়ানূজ্ঞাতম্। পরিত্যজন্তীব মে প্রাণাঃ। ইমেহত্রভবন্তঃ শান্তনুপ্রভৃতয়ো মে পিতৃপিতামহাঃ। এতত্কর্ণমগ্রতঃ কৃত্বা সমুত্থিতং ভ্রাতৃশতম্। অয়মপ্যৈরাবতশিরোবিষক্তঃ কাকপক্ষধরো মহেন্দ্রকরতল-মবলম্ব্য ক্রুদ্ধোহভিভাষতে মামভিমন্যুঃ। উর্বশ্যাদয়োহপ্সরস্যে মামভি-গতাঃ। ইমে মহার্ণবামূর্তিমন্তঃ। এতা গংগাপ্রভৃতয়ো মহানদ্যঃ। এষ সহস্রহংসপ্রযুক্তো মাং নৈতুং বীরবাহী বিমানঃ কালেন প্রেষিতঃ। অয়ময়মাগচ্ছামি। (স্বর্গং গতঃ।)

(যবনিকাস্তরণং করোতি।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—

যাম্যেষ সজ্জনধনানি তপোবনানি
পুত্রপ্রণাশবিফলং হি ধিগস্তু রাজ্যম্।

অশ্বত্থামা— যাতোহদ্য সৌপ্তিকবধোদ্যতবাণপাণিঃ।

(ভরতবাক্যম্)

বলদেবঃ— গাং পাতু নো নরপতিঃ শমিতারিপক্ষঃ ॥৬৬॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ঊরুভঙ্গং নাম নাটকং সমাপ্তম্ ॥

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841804 05X101